সগীর বিন ইমদাদ

কেন জিহাদ করবো?

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
২৮-এ,১ টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল, ঢাকা।

শুভেচ্ছান্তে-

....

তারিখ ঃ

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় দাদা-দাদী ও নানাজানের
রূহের মাগফিরাত কামনার্থে

সগীর বিন ইমদাদ

সূচীপত্র

অবতরণিকা

করুণাময় আল্লাহর দরবারে অসংখ্য হামদ যাঁর অশেষ কৃপায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর ন্যায় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরীযার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অংশ হিসেবে "কেন জিহাদ করব" বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। বিশ্বের সেরা বীর সায়্যেদুল মুজাহিদীন রাসূল (সাঃ)-এর চরণে অসংখ্য দুরুদ ও সালাম, যিনি বদর ময়দানে সিজদায় পড়ে, ওহুদে দান্দান মুবারক শহীদ করে পবিত্র রক্ত ঝরিয়ে, খন্দকে উদরে পাথর বেঁধে, হুনাইনে চার হাজার তীরের মাঝে অটল দাঁড়িয়ে উম্মতকে জিহাদের সবক দিয়েছেন। যাঁর অসংখ্য হাদীসের বাণী আমার অন্তরে এই প্রয়াসের প্রেরণা যুগিয়েছে। এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে, ইহুদী-খ্রীষ্টান ও তাদের দোসর কর্তৃক আজ গোটা মুসলিম উম্মাহ অমানবিক যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। তাদের বর্বরোচিত নিষ্পেষণ ও গ্রাসী নখরাঘাতে আজ রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, লেবানন, তাজিকিস্তান, বার্মা, কাশ্মীর, আসাম, উগান্ডা, সোমালিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো ও হার্জেগোভিনাসহ বিশ্বের সকল মুসলিম ভূখন্ডে। যেখানে মুসলিম উম্মার বাস। সেখানেই তাদের অত্যাচারের তান্ডবলীলা। এই নরপশু প্রেতাত্মারা আজ মুসলিম যুবতীদের ধর্ষণ করে তাদের স্তন কেটে ফুটবল খেলে। গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করে আছড়িয়ে হত্যা করে। যুবকদের মগজ খুলে কুকুরের আহার দিয়ে, নিষ্পাপ শিশুদের অকাতরে হত্যা করে মুসলমানের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু লুন্ঠন করে, মসজিদ-মাদ্রাসা ধবংসস্তূপে পরিণত করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে। তাদের এই নারকীয় তান্ডবলীলায় গোটা নৈসর্গিক ক্রিয়া-কর্ম আজ স্থবির হয়ে পরেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোন মুমিনের অন্তস্থির থাকতে পারেনা। পারেনা সে নীরব দর্শকের গ্যালারীতে বসে থাকতে। আজ নিপীড়িত মানবতার গগণবিদারী আর্তনাদ এবং আগ্রাসন-ক্লিষ্ট ইসলামী কৃষ্টি-কালচার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মসজিদ-মাদ্রসাগুলোর হৃদয়বিদারক বোবা কান্না যুব সমাজকে প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে অস্ত্র হাতে নিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপন বক্ষের তাজা রক্ত দিয়ে জাতিকে হেফাজত করতে।

অথচ আজ মুসলমান এমনকি আলেমগণও চেতনাহীনভাবে, সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা কাফেরদের চক্রান্তের শিকার হয়ে জিহাদের বিরোধী বক্তব্য দিয়ে,

মহান আল্লাহর বিধান ও রাসূল (সাঃ)-এর কৃত আমলকে সন্ত্রাস, আখলাক বিরোধী ও ইসলাম বহির্ভূত কাজ বলে ঈমান হারাচ্ছে। সে সব সত্য সন্ধানী ও জ্ঞান অন্বেষী সাথীদেরকে চক্রান্তের হাত থেকে মুক্ত করে সঠিক পথের সন্ধান দানের লক্ষ্যে, যুব সমাজের হারানো চেতনা পুনরোদ্ধারে, মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনার লক্ষে ও বীর্যশালী বাহুতে আবার ইসলামের শামশীর সাজাতে জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে বইটিকে বিন্যাস করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কেবল মাত্র পাঠকদের কে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এ বই পড়ে একজন যুবকের অন্তরেও যদি সামান্যতম জিহাদের স্পৃহা জাগে, তবে আমার এই শ্রম সার্থক মনে করব।

ভুল-ভ্রান্তি মানুষের সহজাত জিনিস। তাই যদি কোথাও সুধী মহলের সজাগ দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে আমাকে অভিহিত করার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল।

পরিশেষে এ বইয়ের কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহর দরবারে তাদের ইহ ও পারলৌকিক প্রতিদান কামনা করছি। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত
সগীর বিন ইমদাদ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মহান আল্লাহর আদেশ; তাই জিহাদ করব

মহা প্রতাপশালী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আদেশ করেছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

তোমাদের উপর ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) ফরয করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়; অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। বাক্বারা- ২১৬

ঈমানের পর মুসলমানদের উপর নামায! রোযা, হজ্ব, যাকাত যেমন ফরয, ক্বিতাল-ফী সাবীলিল্লাহও তেমনই একটি ফরয। বরং অনেক ক্ষেত্রে নামায-রোযার চেয়েও ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ অধিক জরুরী। তাই আল্লাহ তা’আলাও কুরআন পাকে ক্বিতালের (সশস্ত্র যুদ্ধ) বর্ণনা নামায-রোযার চেয়ে অধিক পরিমাণে করেছেন এবং ক্বিতালের প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করার জন্য প্রিয় হাবীব (সাঃ) কে আদেশ করেছেন-

ইরশাদ হচ্ছে-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে ক্বিতালের প্রতি উৎসাহিত করুন। -আনফাল- ৬৫

এভাবে আয়াত নাযিলের মাধ্যমে অন্য কোন আমলের প্রতি উৎসাহিত করার আদেশ করা হয়নি।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

আপনি আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত

অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদেরকে ক্বিতালের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দিবেন আর আল্লাহ শক্তি সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। -সূরা নিসা- ৮৪

ক্বিতালের (সশস্ত্র যুদ্ধ) খুটি-নাটি প্রতিটি বিষয়ই কুরআনের আয়াত দ্বারা ফরয করা হয়েছে। ক্বিতালের প্রস্তুতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ

তোমরা নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং পালিত ঘোড়া দ্বারা, যাতে তোমরা আতংকিত করতে পার আল্লাহর দুশমন, তোমাদের দুশমনদের উপর তাছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জাননা; আল্লাহ জানেন। -আনফাল ঃ ৬০

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

ولو ارادوا الخروج الاعدوا له عدة

যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার সংকল্প করত, তাহলে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম (যুদ্ধাস্ত্র) প্রস্তুত করত। -তাওবা ঃ ৬৫

দুনিয়ার সর্বত্র অবাধ্য কাফেরদেরকে হত্যার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

পৃথিবীর যেখানেই মুশরিকদের পাও, সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর, বন্দী কর, অবরোধ কর। আর প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাক। -তাওবা-৫

আহলে কিতাবদের হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। তাওবা- ৯২

মুশরিকদের হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন-

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

মুশরিকদের সাথে তোমরা সশস্ত্র যুদ্ধ কর সমবেতভাবে- যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সমবেতভাবে। আর মনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। -তাওবাহ ঃ ৩৬

নিকটবর্তী কাফেরদের হত্যার আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। তাওবাহ- ১২৩

কাফেরদের প্রতি কঠোরতা প্রদানের আদেশ দিয়ে বলেন-

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (التوبة ـ ٧٣)

হে নবী! কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম এবং তা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা। তাওবা- ৭৩

কাফের সর্দারদের হত্যা করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন।

فَقَاتِلُوْا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

তোমরা কাফের নেতাদের হত্যা কর। তাওবাহ- ১২

فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

তোমরা শয়তানের দোসরদের হত্যা কর। নিসা- ৭৬

এমনিভাবে কোথায়, কখন, কার সাথে, কিভাবে যুদ্ধ (জিহাদ) করতে হবে, তার

বিশদ বর্ণনা কালামে পাকে বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের শতাধিক স্থানে মহান আল্লাহ বান্দাকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জিহাদ) করার জন্য আদেশসূচক বাক্য ব্যবহৃত করছেন। এই বিধান পালনার্থে নবী করীম (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে চার ওয়াক্ত নামায কাযা করেছেন, যা জীবনে আর কখনো অন্য কোন আমলের জন্য করেননি। যারা এ আদেশ পালনে সামান্যতমও শিথীলতা প্রদর্শন করেছেন তাদের সাথে দয়ার সাগর, রাহমাতুল্লিল আলামীন পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত ভয়াবহ বয়কট করেছিলেন। এমনকি সেই বয়কট থেকে কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) এর মত জলীলুল ক্বদর বদরী সাহাবীও রেহাই পাননি, অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন খাদেম ছাড়া চলা-ফেরা করা বড় কষ্টকর। সেই পরিস্থিতিতেও আপন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এ সব ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ-এর গুরুত্ব কত অপরিসীম।

এ ছাড়াও এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাকে জাহেলী যুগের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আমলের সাথে তুলনা করেছেন।

ইসলামের শুরু যুগে বাইতুল্লাহ শরীফের চাবি বহন, বাইতুল্লাহ শরীফে রাত্রি যাপন এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো প্রভৃতি কাজ সর্বোত্তম আমল বলে বিবেচিত হত। আর এটা তাদের গর্বেরও কারণ ছিল।

ইসলামের সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরণের পরও অনেকের মাঝে এসব নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলছিল। একদিন হযরত ত্বালহা বিন শায়বা (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে নিজ নিজ আমলের মর্যাদার আলোচনা চলছিল। হযরত ত্বালহা (রাঃ) বললেন, আমার যে ফযীলত, তা তোমাদের নেই। বাইতুল্লাহ শরীফের চাবি আমার হাতে। ইচ্ছে করলেই আমি বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে রাত্রি যাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদে হারামের সমস্ত ক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। সব শেষে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, বুঝতে পারছিনা এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার আগে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাদের এই আলোচনা ও বিতর্কের

ফলাফল ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদে হারাম আবাদ করাকে সে লোকদের (আমলের) সমান মনে কর? যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। এরা আল্লাহর নিকট সমান নয়। আর আল্লাহ জালেমদেরকে হেদায়েত দান করেন না। -তাওবা ঃ ১৯

মুসলিম শরীফে এ আয়াতের আরেকটি প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। হযরত নোমান বিন বশীর (রাঃ) বলেন, একদা জুমু'আর দিন আমি কতিপয় সাহাবীর সাথে মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাপূর্ণ আমল আর নেই এবং অন্য কোন আমল এর সমকক্ষও হতে পারে না। আর আমিও এর মোকাবেলায় অন্য কোন আমলের ধার ধারিনা। তাঁর উক্তি খন্ডন করতে গিয়ে অপর এক সাহাবী বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ (ক্বিতাল) করার মত কোন আমল নেই। এভাবে দু'জনের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূল (সাঃ) এর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর! তাঁরা আলোচনা বন্ধ করে দিল। এরপর জুমুআর নামায আদায় করা হল। নামাজ শেষে তাঁরা হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপন করে মীমাংসা চাইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর' জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' কে প্রাধান্য দিয়ে মতোনৈক্যের সমাধানপূর্বক চিরকালের জন্য মুজাহিদদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সঙ্গত কারণেই অনেকের অন্তরে প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, জিহাদ যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ আমল, যার জন্য খন্দকের যুদ্ধে নবী কারীম (সাঃ) লাগাতার চার ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত কাজা করেছেন, এতদ্বসত্ত্বেও একে ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলনা কেন?

আলোচিত প্রশ্নের চমৎকার চমৎকার বহু সমাধান রয়েছে, যার মধ্য হতে দু'টি

নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের রোকন নয় ঠিক, কিন্তু তা মানব জাতির সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু 'ঈমান'-এর ভিত্তি, যে ঈমান ব্যতীত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত তথা ইসলামের কোন আমলই কাজে আসবে না। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

ثَلَثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانَ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَااِلَهَ الا اللّٰه لَا تُكَفِّره بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجَهُ مِنَ الْاَسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِىَ اللهِ اِلَى اَنْ يُقَاتِلَ اَخِرهٰذِه الْاُمَّةِ الدَجَال لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلِ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَار-

অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তি তিনটি-

এক. যে ব্যক্তি কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়েছে, তার উপর আক্রমন করা থেকে বিরত থাকা। কোন গুনাহের কারণে কাউকে কা.ফের না বলা। কোন আমলের কারণে কাউকে ইসলামের বহির্ভুত মনে না করা। (কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফুরী পাওয়া যায়, তবে কোন ক্ষতি নেই।)

দুই. যেদিন থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন থেকে এই উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত এ জিহাদ চলতে থাকবে। কোন স্বৈরাচারী শাসনের দুঃশাসন বা কোন ন্যায়পরায়ণ হাকিমের সুবিচার জিহাদকে রহিত করতে পারবে না।

তিন. তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা। -মিশকাত- ১৭

দ্বিতীয়ত ঃ ছোট একটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে। সন্দ্বীপ মোড়ল বাড়ীতে বিয়ে অনুষ্ঠান। কনের বাড়ি সেখানে। বর পক্ষকে বিশাল এক সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে হবে। সময় মত সকলে পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা একমাত্র বাহন জাহাজে আরোহণ করল। জাহাজ সকলকে পানি ও পানির তলদেশে বসবাসকারী হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা করে গন্তব্যের দিকে নিয়ে চলল। এই মূহূর্তে তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য জাহাজই একমাত্র অবলম্বন। কোন ক্রমে জাহাজটি ডুবে গেলে পানি ও হিংস্র প্রাণীর গ্রাসী থাবা থেকে কেউ রক্ষা পাবেনা।

সুধী! দেখুন, এখানে জাহাজের ভূমিকা জীবন-মরণের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু

তাই বলে কেউ তো এই জাহাজটিকে বরযাত্রীর অন্তর্ভুক্ত বলে না। বরং সকলেই একে নিরাপদে গন্তব্যে পৌছার একমাত্র মাধ্যমই বলে। ঠিক তদ্রূপ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত- এসব হলো ইসলাম। আর এই ইসলামকে সকল প্রকার শত্রু থেকে হেফাযত করে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর একমাত্র মাধ্যম ক্বিতাল ফী সাবীল্লিাহ। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اَلْجِهَادُ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ- জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম দুনিয়ার বুকে সকল ধর্মের উপর মর্যাদার সাথে বিরাজ করবে।

উম্মতে মুহাম্মদী যখনই আল্লাহর অপরিবর্তনশীল বিধান ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহকে পরিত্যাগ করবে, তখন ইসলাম লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, কুরআন ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবে, রাসূল (সাঃ)-কে গালি দেয়া হবে; কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রতিশোধ নেয়ার মত কোন লোক থাকবে না। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ اَىْ اِلٰى جِهَادِكُمْ

অর্থাৎ যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান ও অপদস্থতা চাপিয়ে দিবেন, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীন তথা জিহাদকে পুনরায় আঁকড়িয়ে ধরবে।

এখানে রাসূল (সাঃ) দ্বীনের ব্যাখ্যা জিহাদ দ্বারা করেছেন। কারণ, উম্মতের মাঝে জিহাদ থাকবে তো দ্বীন ইজ্জতের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। সাধারণত কোন একটি বৃক্ষই যখন রোপণের পর তার হেফাজতের জন্য প্রহরী বা বেষ্টনী প্রয়োজন হয়, প্রহরী বা বেষ্টনী ব্যতীত পূর্ণ হেফাজত থাকেনা। তখন এত বড় দ্বীনে ইসলামকে ঠিক রাখার জন্য কি কোন বেষ্টনীর প্রয়োজন নেই? অবশ্যই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবীগণের পাহারা দ্বারা তা ঠিক রেখেছেন। নবীগণের নেতৃত্বে জিহাদ হয়েছে, দাওয়াত হয়েছে, বিভিন্নভাবে দ্বীনকে হেফাজত করা হয়েছে। কিন্তু হুজুর (সাঃ) যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাই তাঁর রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এমনই এক বেষ্টনী দিয়েছেন, যা

অতিক্রম করে কাফের-মুশরেক দ্বীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং এই বেষ্টনী কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ

যারা মুমিন, তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয়না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মুর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সতরাং ধ্বংস তাদের জন্য। -মুহাম্মদ ঃ ২০২

আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল سورة محكمة শরীয়তের পরিভাষায় محكم শব্দটি منسوخ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে "মুহকামাহ" সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মানসূখ ও রহিত না হলেই তাতে কোন সন্দেহ ব্যতীত পরিপূর্ণরূপে আমল করা যেতে পারে। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব "মুহকামা" তথা অরহিত। পবিত্র কালামে পাকের একমাত্র কিতালের আয়াত محكم তথা 'অরহিত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কোন আমলের ব্যাপারে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নত বিধায় জিহাদ করব

মানবজাতির অহংকার, আসমান-যমীন সৃষ্টির উৎস নবীউস সাইফ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-যাঁর শুভাগমনে আঁধারঘেরা মানবতা পেয়েছে মুক্তির দীপ্ত আলো। সে মহামানব রাসূল (সাঃ) দয়ার আধার হওয়ার সত্ত্বেও নিজ হাতে তলোয়ার উচিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। নিজের দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন, পবিত্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তরঞ্জিত করেছেন। মদীনার দশ বছরে সাতাশটি যুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন।

যে সমস্ত যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্মে উল্লেখ করা হল।

গাযওয়া আবওয়া

(২য় হিজরী সফর মাস)

ইসলামের সর্ব প্রথম গাযওয়া হল গাযওয়া আবহাওয়া।-এর অপর নাম গাযওয়া ওয়াদ্দান। ২য় হিজরীর সফর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬০ জন মুহাজিরের এক বাহিনী কুরাইশ ও বনু জুমরাহ বাহিনীর উপর হামলা করার জন্য আবওয়া নামক স্থানে গমণ করেন। রাসূল (সাঃ) হযরত সাইদ বিন ওবাদাহ (রাঃ) কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করে যান। এ যুদ্ধের ঝাণ্ডা হযরত হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর হাতে ছিল। মুসলিম বাহিনী আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কুরাইশদের সন্ধান মিলেনি। শুধু বনী জুমরাহ চুক্তিবদ্ধ হয় যে, বনু জুমরাহ কোন লোক মুসলমানদের সাথে কখনো যুদ্ধ করবে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদেরও সাহায্য করবেনা। মুসলমনদের কোন প্রকার ক্ষতি করবে না। প্রয়োজনে যে কোন সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এই চুক্তিতে বনু জুমরাহ গোত্রের সরদার মুখশী বিন আমর স্বাক্ষর করে। উক্ত স্থানে রাসূল (সাঃ) পনেরদিন অবস্থান করে বিনা যুদ্ধে মদীনায় প্রত্যাগমন করেন। (ফাতহুল বারী- ৭ম খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, সিরাতে মুস্তফা- ২য় খণ্ড-৮৭ পৃষ্ঠা)

গাযওয়া বুয়াত

(২য় হিজরী রবিউল আউয়াল)

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মতান্তরে রবিউস সানী মাসে নবী করীম (সাঃ) দুইশত মুহাজির মুজাহিদকে সাথে নিয়ে কুরাইশদের এক বিশাল বাণিজ্য কাফেলা প্রতিরোধের জন্য বুয়াত নামক স্থানে গমন করেন। ঐ অবস্থায় মদীনার গভর্নর ছিলেন দু' দুই বার হাবশা হিজরতকারী সাহাবী সায়ীব ইবনে ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) প্রতিপক্ষ কুরাইশ সর্দার ওমাইয়া ইবনে খালফ তাঁর একশত সৈনিক ও আড়াই হাজার উট নিয়ে স্থান ত্যাগ করে। রাসূল (সাঃ) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে কোন যুদ্ধ ব্যতীতই মদীনায় ফিরে আসেন।

গাযওয়া উশাইরাহ

(২য় হিজরী জমাদিউল উলা)

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে দুইশত মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশ

বাহিনীর উপর হামলা করার জন্য উশাইরাহ নামক স্থানে গমন করে, (যা নাইবু নামক স্থানের নিকটবর্তী) সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করে জমাদিউস সানী মাসে কবিলা বনী মাদরীজ-এর সাথে এক সন্ধি স্থাপন করে যুদ্ধবিহীন অবস্থায় মদীনা প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময় মদীনার গভর্নর ছিলেন হযরত আবু সুলাইমান আবদুল আসআদ (রাঃ)

গাযওয়া সাফওয়ান

(২য় হিজরী জমাদিউস সানী মাস)

গাযওয়া উশাইরা থেকে প্রত্যাগমনের দশদিন পর জমাদিউস সানী মাসেই কারুজ বিন যাবের ফাহরী নামক জনৈক ব্যক্তি তার দলবল নিয়ে মদীনার চারণভূমি থেকে জোরপূর্বক সমস্ত উট ও বকরি নিয়ে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়েই রাসূল (সাঃ) স্বদলবলে সাফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেন; কিন্তু তাদের সন্ধান না পেয়ে যুদ্ধ ব্যতীতই মদীনা ফিরে আসেন। ঐ সময় মদীনার গভর্নর ছিলেন যায়েদ বিন হারেস (রাঃ)। সাফওয়ান নামক স্থানটি বদরের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাকে 'বদরে উলা'ও বলা হয়।

গাযওয়া বদরে কুবরা

(২য় হিজরী রমযানুল মুবারক মাস)

বহু প্রতিক্ষার পর মুসলমানরা সবেমাত্র নির্যাতনের পাহাড়চাপা থেকে মুক্তি পেয়ে এক অবিস্মরণীয় আমেজে রমযান উদযাপন করছিল। সিয়ামে রমযান সকলেই ইবাদতে মত্ত। দুনিয়ার কোন ব্যস্ততাই নেই তাদের, কিন্তু ঠিক এমনি মুহূর্তে ভেসে এল এক অশুভ সংবাদ। 'স্বার্থভোগী, খোদাদ্রোহী বেঈমান প্রতিমা পূজারীর দল মুসলমানদের সমূলে নিঃশেষের পরিকল্পনায় সংগ্রহ করছে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র। তার এক বিরাট অংশ মদীনার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে। পথেই তাকে ঠেকাতে হবে, অন্যথায় সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই কাফেলাকে প্রতিরোধের জন্য দ্বিতীয় হিজরীর দশই রমযান রাসূল (সাঃ) ৩১৩ জন জানবাজ সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। কুরাইশ সর্দার (আবু সুফিয়ান) অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে দামদাম বিন আমর আল-গাফফারীর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করল। কুরাইশের অন্য সর্দারদের কাছে এবং নিজেও

রাস্তা পরিবর্তন করে চলল। এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ান চলে গেল নিরাপদে কিন্তু তার সাহায্যকারী বিশাল বাহিনী এসে উপস্থিত হল বদর প্রান্তে। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল, সব মুসলমান যুদ্ধ করে গর্দান দিয়ে দিবে; কিন্তু বেঈমানদের সামনে মাথানত করবে না। যুদ্ধ সংঘটিত হল ১৭ রমযান। এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম কাফেরদের তিনজন (উতবা-শাইবা ও ওয়ালীদ) মুসলমানদের তিনজন (হামযা, আলী, ও আবু উবাইদা (রাঃ) ময়দানে আবতরণ করেন। মুসলমানরাই সফল হন। অবশেষে সম্মিলিত যুদ্ধে এক হাজার কাফেরের মধ্যে ৭০ জন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। যাদের মধ্যে আবু জাহেলসহ ১৪ জন বড় বড় কোরাইশ সর্দার রয়েছে। বন্দি হয়ে ৭০ জন। এদের মাঝে রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস এবং জামাতাও ছিলেন। মুসলমান আল্লাহ তা'আলা সাহায্যে ইতিহাসের এক বিশাল বিজয় অর্জন করেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হতে মাত্র ১৪ জন সৌভাগ্যবান সাহাবী শাহাদাতের সুধাপান করে চিরস্থায়ী জান্নাতবাসী হন। এ যুদ্ধে বহু গনীমতের মাল অর্জন হয়, যা পরে রাসূল (সাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-ও যারা ওজরের কারণে যুদ্ধে আসতে পারেননি এমন আটজন সহ সকল মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেন।

গাযওয়া ক্বারক্বারাতুল ক্বদর

(২য় হিজরী শাওয়াল মাস)

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে নবী করীম (সাঃ) বনী সলীম ও গাফফান গোত্রের সম্মিলিত হামলার খবর পেয়ে দুইশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। চশমায়ে ক্বদর নামক স্থানে পৌছে জানতে পারলেন যে, কাফেররা ভয়ে পলায়ন করেছে। রাসূল (সাঃ) সেখানে তিন দিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন। কোন যুদ্ধ হয়নি।

গাযওয়া বনু কায়নুকা

(২য় হিজরী শাওয়াল মাস)

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর বংশধর বুন কায়নুকা। বদরে মুসলমানদের বিজয় তাদের অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারা

মদীনা সনদে মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিরোধিতা শুরু করল। শতর্ক করার জন্য রাসূল (সাঃ) এক বাজারে উপস্থিত হয়ে তাদের সমবেত করে বক্তব্য দিলেন-
"হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যেভাবে কুরাইশদের উপর আযাব এসেছে. তোমাদের উপরও তা যেন না আসে। হে ইহুদীগণ, তোমরা ভাল করেই জেনেছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা তোমাদের কিতাবে পেয়েছ এবং আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই অঙ্গীকার নিয়েছেন।" রাসূল (সাঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে ইহুদীরা যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। তারা উত্তর করল, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি অসহায়, দুর্বল ও যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ সম্প্রদায়ের সাথে বিজয়ী হয়েছেন। যদি আমাদের সাথে মুকাবেলা হয়, তবে বুঝতে পারবেন, যুদ্ধ কাকে বলে। বনী কাইনুকা এর মাধ্যমে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। রাসূল (সাঃ) আবু লুবাবাহ বিন আবদে মানজারা আনসারী (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নির্ধারণ করে মদীনার প্রান্তে বনী কাইনুকার দুর্গ অবরোধ করেন। ১৫ই শাওয়াল থেকে যীকাদা পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখার পর আত্মসমর্পন করে। রাসূল (সাঃ) হত্যার পরিবর্তে তাদের দেশান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন।

গাযওয়া সাওয়ীক

(২য় হিজরী যিলহজ মাস)

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে অপদস্থ ও পরাজিত হয়ে মুশরিকরা মক্কায় পৌঁছলে আবু সুফিয়ান বিন হারব নামক এক ব্যক্তি শপথ করল যে, যতক্ষণ না মদীনায় পুনরায় হামলা করতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত ফরয গোসল করব না। এই শপথ পুরা করার জন্য লোকটি ৫ই যিলহজ্ব দু'শত অশ্বারোহী নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়। ওরাইজ নামক স্থানে গিয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করে দুইজন কর্মচারীকে শহীদ করে এবং কিছু খেজুর গাছ আগুনে জ্বালিয়ে শপথ পূর্ণ করে। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) দুইশত মুজাহিদ নিয়ে তাদের ধাওয়া করেন। কিন্তু তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারা অতি দ্রুত পৌঁছার জন্য সমস্ত সাতুর বস্তা ও অন্যসব সামগ্রী ফেলে যায়। মুসলমানগণ ঐগুলো মালে ফায় হিসেবে গ্রহণ করে।

গাযওয়া গাতফান

(৩য় হিজরী মুহাররম মাস)

গাযওয়া সাওয়ীক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সাঃ) কিছুদিন মদীনায় অতিবাহিত করেন। মদীনায় অবস্থানকালে তিনি শুনতে পান যে, বনী সালাবা ও বনী মুহারিবের সমস্ত যোদ্ধা মদীনায় হামলার উদ্দেশ্যে গাতফান গোত্রে এসে একত্রিত হচ্ছে। রাসূল (সাঃ) তাদের প্রতিরোধের লক্ষ্যে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নির্বাচন করে তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে ৪৫০ জন মুজাহিদ নিয়ে গাতফান গোত্রে হামলার জন্য রওনা করেন। রাসূল (সাঃ)-এর আগমন সংবাদ পেয়েই যায় সকলে পালিয়ে। শুধু মাত্র বনু সালাবার এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। সেখানে রাসূল (সঃ) পুরো সফর মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হয়নি। তবে এরই মাঝে এক বিরাট মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। তা হল, একদা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সাঃ) বৃষ্টিতে ভিজে গেছেন। সকলেই কাপড় শুকানোর কাজে ব্যস্ত। রাসূল ও (সাঃ) কাপড় শুকাতে দিয়ে এক বৃক্ষের নীচে শুয়ে পড়েন। এ সুযোগকে গণীমত মনে করে এক ইহুদী রাসূল (সাঃ)-এর মাথা মোবারকের পাশে দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে মুহাম্মদ! এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ। হযরত জিব্রাইল (আঃ) লোকটির হাতে একটি আঘাত করলেন, যার ফলে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল।

গাযওয়া নাজরান

(৩য় হিজরী রবিউসসানী মাস)

গাযওয়া গাতফান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একমাস মদীনায় অবস্থানকালে নবীজির (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে, নাজরান গোত্রের নিকট বনী সালেমের লোকজন একত্রিত হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য। রাসূল (সাঃ) তাদের প্রতিরোধের জন্য তৃতীয় হিজরীর রবিউস্সানী মাসে ৩০০ সাহাবী নিয়ে নাজরান গোত্রের দিকে ছুটে চললেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) ছিলেন মদীনার আমীর। নাজরান গোত্রীয় লোকেরা সংবাদ পেয়েই পালিয়ে

গেল। রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ ব্যতীত দশ-পনেরদিন সেখানে অবস্থান করে মদীনা প্রত্যাগমন করেন।

গাওয়া উহুদ

(৩য় হিজরী শাওয়াল মাস)

বদরে পরাজিত কুরাইশ অপমানের বিষক্রিয়াকে হজম করতে পারছিল না কিছুতেই। তাদের চির অহংকারের সৌধটি চূর্ণ হয়ে গেল নিমিষে। তারা প্রতিশোধের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিল সুকৌশলে। একদিকে বাণিজ্যের সকল সম্পদ, চাঁদা করা অর্থ জমাচ্ছিল দারুন্নাদওয়াতে মানসিক উৎসাহের জন্য বিভিন্ন কবীর কবিতা এবং বিভিন্ন নারীর টিপ্পনি অনুষ্ঠান করছিল। এক পর্যায়ে ১৫জন মহিলাসহ তিন হাজার জানবাজ যোদ্ধা নিয়ে ৫ই শাওয়াল মক্কা থেকে রওয়ানা করে। এ সংবাদ হযরত আব্বাস (রাঃ) দূত মারফত মদীনায় পাঠিয়ে দেন। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ করেন। এতে যুবক সাহাবীদের অধিক আগ্রহ ও পীড়াপীড়ির কারণে রাসূল (সাঃ) আপন ইচ্ছার বিপরীতে মদীনার বাইরে গিয়ে হামলা করার সিদ্ধান্ত দিলেন। শুক্রবার জুম'আর পর জিহাদের উপর জোরালো বয়ান করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিলেন। ১১ই শাওয়াল তৃতীয় হিজরী জুম'আর দিন বাদ আসর এক হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূল (সাঃ) ঘোড়সাওয়ার অবস্থায় মদীনা ত্যাগ করেন। উহুদের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে মুনাফিকের দল আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর নেতৃত্বে চলে আসে। সাতশত জনের মধ্যে একশত লৌহবর্ম ও দু'টি অশ্ব ছিল।

পক্ষান্তরে কাফেরদের নিকট ছিল সাতশত লৌহবর্ম, দুইশত ঘোড়া ও তিন হাজার উট। কবিতার মাধ্যমে পুরুষদের উৎসাহ দেয়ার জন্য পনেরজন মহিলাও ছিল। এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের বিজয় অর্জন হয়েছিল। মুসলমান গনীমতের মাল সংগ্রহ করছিলেন। এমতাবস্থায় উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থানকারী মুসলমান মুজাহিদগণ বিজয়ের উল্লাসে গনীমত অর্জনের জন্য আপন স্থান ত্যাগ করেন। সুযোগকে গনীমত মনে করে পিছন থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ অকল্পনীয়ভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে মুসলমানগণ এক সাথে দু'দিকের আক্রমণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ ভয়াবহ

আক্রমণে স্বংয় রাসূল (সাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে পড়ে। হযরত হামযা ও হানজালা (রাঃ) সহ ৭০জন জানবাজ সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন।

গাযওয়া হামরাউল আসাদ

(৩য় হিজরী শাওয়াল মাস)

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় দেখে কুরাইশরা উল্লাসে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে মক্কার দিকে। হঠাৎ পথে স্মরণ হয়, হায় সুযোগ তো হাতছাড়া হয়ে গেল! এই তো সুযোগ মদীনায় হামলা করার! মুসলমান সকলেই আহত ও বিপর্যস্ত। সফর বিরতি দিয়ে কুরাইশরা রাওয়াহা নামক স্থানে পরামর্শে বসল। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) তৃতীয় হিজরীর ১৬ ই শাওয়াল সোমবার দিন মদীনায় বেলাল (রাঃ)-এর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, তারাই যেন পুনরায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। সকলে লাব্বাইক বলে রাসূল (সাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিলে রাসূল (সাঃ) ঐ দিনই মদীনা ত্যাগ করে হামরাউল আসাদ নামক স্থান গিয়ে উপস্থিত হন।

রাসূল (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে বনী খোজ'আ গোত্রের সর্দার মা'বাদ খাজয়ী এসে সহমর্মীতা জানায়। মা'বাদ সেখান থেকে গিয়েই সরাসরি আবু সুফিয়ানের নিকট উপস্থিত হয়। আবু সুফিয়ান মুসলমানদের অসহায়ত্বের সুযোগে মদীনায় হামলার স্বপ্ন ব্যক্ত করে। মা'বাদ প্রতি উত্তরে বলল, তুমি যা স্বপ্ন দেখছ, তা সম্ভব নয়। কারণ, মুহাম্মদ অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে তোমাদের মোকাবেলার জন্য দলবলসহ মদীনা থেকে রওনা হয়ে গেছেন। আবু সুফিয়ান তার সংবাদে ভীত হয়ে মদীনায় হামলার স্বপ্ন বাদ দিয়ে দ্রুত মক্কার দিকে ফিরে যায়। রাসূল (সঃ) কাফেরদের চলে যাওয়ার পরও সে স্থানে তিনদিন অবস্থান করে শুক্রবার দিন মদীনায় ফিরে যান।

গাযওয়া বনী নাজীর

(৪র্থ হিজরী রবিউল আউয়াল মাস)

আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বনী আমেরের দুই মুশরিককে হত্যা করে ফেলেছিলেন এজন্য যে, তারা ইতিপূর্বে সত্তরজন বিজ্ঞ হাফেজ ও ক্বারীকে

শহীদ করেছে। হযরত আমর (রাঃ)-এর জানা ছিল না যে, এই গোত্রের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে। রাসূল (সাঃ) সংবাদ পেয়েই দিয়াতের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। চুক্তিবদ্ধ মৈত্রী হিসেবে বনী নাজীরের উপর দিয়াতে যে অংশ অর্পিত হয়েছিল, তা আনতে রাসূল (সাঃ) হযরত আবুবকর, হযরত ওমর ফারুক হযরত উসমান, যোবায়ের, তালহা, আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের সাথে নিয়ে বনী নাজীরের নিকট গমন করেন, তারা রাসূল (সাঃ)কে এক প্রাচীরের নীচে বসিয়ে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করছিল। সাথে সাথে দিয়ত ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছিল। কিন্তু গোপনীয়ভাবে তারা রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার হীন ষড়যন্ত্র হিসেবে এক ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে, সে প্রাচীরের উপর থেকে বড় পাথর নিক্ষেপ করে রাসূল (সাঃ)-কে শহীদ করে দিবে। কিন্তু তাদের এ চক্রান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার নয়। আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-কে তাদের গাদ্দারী সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন। রাসূল (সাঃ) কোন জরুরতের ভান করে সেখান থেকে উঠে সোজা মদীনায় চলে আসলেন। সাহাবীগণ বহু সময় অপেক্ষা করে রাসূল (সাঃ)-এর সন্ধানে মদীনায় চলে যিনি। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে বনী নাজীরের গাদ্দারী সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নির্ধারণ করে ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বনী নাজীরের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করেন। পনেরদিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয়। তাদের বাগান ও গবাদী পশুগুলোকে জালিয়ে দেয়া হয়। এতে তারা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করে। রাসূল (সাঃ) তাদের দশদিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন যে, এই সময়ের মধ্যে বাহনে যা বহন করা যায়, সে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে মদীনা ত্যাগ করতে হবে। তারা তাই করল। দশদিনে সমস্ত কিছু নিয়ে কেউ খাইবার, কেউ শামে চলে গেল।

গাযওয়া যাতুর রিকা

(৪র্থ হিজরী জুমাদাল উলা)

৪র্থ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ এল যে,

বনি সালাবা হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসূল (সাঃ) তাদের মোকাবেলা করার জন্য চারশত সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে নজদের দিকে রওয়ানা করলেন। নজদে পৌছে বনী গাতফানের কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে সালাতুল খাউফের নামাজ পড়েন। তাদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ হয়নি।
হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন- এই যুদ্ধকে যাতুর রিকা এজন্য বলা হয় যে, যেহেতু প্রচুর হাঁটার দরুন মুজাহিদদের পা ফেটে গিয়েছিল এবং সে স্থানে পট্টি বাধা হয়েছিল।

গাযওয়া বদরে সুগরা

(৪র্থ হিজরী শাবান)

গাযওয়া যাতুর রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করে শাবানের শুরু দিকে উহুদের কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) পনেরশত সাহাবীকে সাথে নিয়ে বদর প্রান্তে উপস্থিত হন। কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কা বাসীদের সাথে নিয়ে মুসাররা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে গরম ও দূর্ভিক্ষের ওজর দেখিয়ে পলায়ন করে মক্কায় ফিরে যায়। রাসূল (সাঃ) সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীতই মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

গাযওয়া দাওমাতুল জান্দাল

(৫ম হিজরী রবিউল আউয়াল)

রাসূল (সাঃ)-কে সংবাদ দেয়া হল যে, জান্দালের অধিবাসী দুইবার মদীনায় আক্রমণ করতে চেয়েছে। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) এক হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ২৫শে রবিউল আউয়াল ৫ম হিজরীতে দাওমাতুল জান্দালের দিকে রওয়ানা হলেন। শত্রু পক্ষ সংবাদ পেয়েই পলায়ন করে। বিধায় রাসূল (সাঃ) কোন যুদ্ধ ব্যতীতই মদীনার দিকে প্রত্যাগমন করেন।

গাযওয়া বনী মুসতালিক

(৫ম হিজরী শাবান)

রাসূল (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ এল যে, বনী মুসতালিকের সর্দার হারেস বিন

আবী যারার মুসলমানদের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসূল (সাঃ) সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হযরত বুরাইদাহ ইবনে হোনাইনাল আসলামী (রাঃ)-কে পাঠালেন। সত্যতা যাচাইয়ের পর রাসূল ৫ম হিজরীর শাবানের দ্বিতীয় তারিখে সাহাবা কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসতালিকের উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

মদীনার গভর্নর ছিলেন যায়েদ বিন হারেস (রাঃ)। তিনি অত্যন্ত দ্রুত গিয়ে অতর্কিতভাবে তাদের উপর হামলা করে বসেন। শত্রুপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তারা দশজন নিহত হয়। বাকী সকলেই গ্রেফতার হয়।

এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে ২০০০ উট, ৫০০০ বকরী এবং দুইশত ঘোড়া মুসলমানদের হস্তগত হয়।

গাযওয়া খন্দক

(৫ম হিজরী শাওয়াল)

এ যুদ্ধের অপর নাম গাযওয়া আহযাব তথা বহুজাতিক বাহিনীর যুদ্ধ। যেহেতু এ যুদ্ধে আরবের সমস্ত কাফের জাতি বা গোত্র সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেছিল, তাই তাকে আহযাব বলে।

মদীনা থেকে উহুদীদের বহিষ্কার ও বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে আক্রমণ সবাইকে শেষবারের মতো শক্তি পরীক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করল। জ্বলন্ত এ প্রতিশোধ অগ্নিতে ইন্ধন যোগানের জন্য বনী নাজীরের সর্দার হুয়াই বিন আখতাব, কেনানা বিন রাবীসহ বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও কবি মহিলারা মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সমস্ত লোকদের নিকট পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিল। এক পর্যায়ে দশ হাজার যোদ্ধা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনায় হামলার জন্য অগ্রসর হয়। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) পরিখা খনন করে নেয়ার পরামর্শ প্রদান করলেন, যাতে তার আড়াল থেকে তাদের মোকাবেলা করা যায়। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং দশ হাজার সাহাবীকে দশগজ করে খননের নকশা এঁকে দিয়ে, নিজে এক গ্রুপের সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। এ হিসাবে খন্দকের পরিমাণ হয় লম্বায় ছয় হাজার গজ। চওড়া ও গভীরতা দশ

হাতের চেয়ে বেশী। এক কথায় বুঝা যায়, একটি ঘোড়া তা লাফিয়ে আসতে পারবে না। নীচে পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা কেরাম পেটে পাথর বেঁধে খন্দক খনন করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে রাসূল (সাঃ) চার ওয়াক্ত নামাজ পর্যন্ত ক্বাযা করেছেন, যা অন্য কোন আমলের জন্য করেননি। কাফেরদের বিশাল বাহিনী পনেরদিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর হযরত নুমান বিন বাশীর (রাঃ)-এর বিচক্ষণতা ও কৌশলের ফলে তাদের মাঝে দ্বন্ধ শুরু হয় এবং পরিশেষে আল্লাহর প্রকাশ্য সাহায্য ঝঞ্ঝা বায়ুর কারণে মাল-সামানা সব রেখেই পালাতে বাধ্য হয়।

গাযওয়া বনী কুরাইযা

(৫ম হিজরী যি'ক্বাদাহ)

খন্দকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা কেরাম অস্ত্র-শস্ত্র রেখে পোশাক-পরিচ্ছদ খোলার আয়োজন করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যুদ্ধের পোশাক পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরে সাওয়ার হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি যুদ্ধ সামগ্রী রেখে দিয়েছেন? রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ! হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ফেরেশতাগণ এখনো যুদ্ধ সামগ্রী রাখেনি। তারা রণাঙ্গনও ত্যাগ করেনি। আপনাকে আল্লাহ তাআলা বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে হামলা করার আদেশ দিয়েছেন। আমি (জিব্রাঈল) এখনই সেদিকে যাচ্ছি। রাসূল (সাঃ) আদেশ পেয়েই সাহাবীদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, তোমরা বনু কুরাইজায় গিয়ে আসর নামায পড়বে।

রাসূল (সাঃ)-এর ঘোষণার সাথে সাথে সাহাবা কেরাম সকল ক্লান্তি দূর করে ছুটলেন উল্কা বেগে। কেউ গন্তব্যে গিয়ে নামায পড়লেন, কেউবা পথে পড়ে নিয়েছেন। সকল সাহাবী উপস্থিত হলে রাসূল (সাঃ) বনু কুরাইযাকে বয়কট করার আদেশ দিলে লাগাতার পঁচিশদিন অবরোধ করে রাখার পর তারা তাদের প্রাক্তন নেতা হযরত সাদ বিন মা'আজ (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার উপর অঙ্গীকার করল। হযরত সাদ (রাঃ)-কে আনা হলে তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সমস্ত যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং তাদের সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের মাঝে গনীমত হিসেবে বন্টন হয়ে যাবে। তাঁর সিদ্ধান্তে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত

আনন্দিত হয়ে বললেন, সাদঁ তুমি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার করেছ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত পুরুষদের গ্রেফতার করে মদীনায় আনা হল। পরে দু'জন- চারজন করে সকলকে হত্যা করা হল।

গাযওয়া বনু লিহয়া

(৬ষ্ঠ হিজরী রবিউল আউয়াল)

রাসূল (সাঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আসেম বিন ছাবেত ও খুবাইব বিন আদীসহ অন্য রাজীর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য দুইশত অশ্বারোহী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। বনী লিহয়ার লোক রাসূল (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে পূর্ব থেকেই পালিয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) সেখানে দুই দিন অবস্থান করেন। এ দু'দিনে ছোট ছোট সৈন্যদল বিভিন্ন দিকে পাঠান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নেতৃত্বেও দশজনের এক বাহিনী বিভিন্ন পাহাড়ে তাদের সন্ধান করে অবশেষে কোন যুদ্ধ ব্যতীতই সকলে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

গাযওয়া যী-কারদ

(৬ষ্ঠ হিজরী রবিউল আউয়াল)

যী-কারদ এক ঝর্ণার নাম, যা গাতফান গোত্রের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাসূল (সাঃ)-এর উটের বিচরণভূমি তারই নিকটে। একদা ওয়াইনা বিন হাসীন ফাজারী চল্লিশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তথায় হামলা চালিয়ে রাখালকে হত্যা করে এবং সমস্ত উট নিয়ে যায়। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া সংবাদ পেয়েই সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য ছুটে যান। যাওয়ার সময় এক টিলার উপরে উঠে উচ্চস্বরে চিৎকার করে মদীনাবাসীকে সংবাদ দিয়ে দেন। সালামা ইবনে আকওয়া অত্যন্ত দক্ষ তীরান্দাজ ও দৌড়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি অশ্ববেগে দৌড়িয়ে তাদেরকে এক ঝর্ণার পাশে পেয়ে যান। সন্ধান পেয়ে সালামা ইবনে আকওয়া একাই বহু লোকের মত আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে সমস্ত উট কেড়ে আনেন। সাথে সাথে আরো ত্রিশটি চাদরও অতিরিক্ত পেয়ে যান, যা শত্রু পক্ষ ফেলেই পলায়ন করেছিল। রাসূল (সাঃ) সংবাদ পেয়ে সাতশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনা স্থলে পৌছার পূবেই তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। রাসূল

(সাঃ) তাদেরকে পলায়নের পথে ছেড়ে দিলেন। সাহাবা কেরামকে তাদের ধাওয়া করতে বারণ করলেন। এ যুদ্ধে দুইজন মুশরিক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় এবং একজন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। রাসূল (সাঃ) ঐ স্থানে পাঁচদিন অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

গাযওয়া সালহে হোদায়বিয়া

(৬ষ্ঠ হিজরী যিক্বাদাহ মাস)

মক্কা থেকে নয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম হোদায়বিয়া-এর নামেই ঐ গ্রামের নামও রাখা হয়েছে হোদায়বিয়া।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল (সাঃ) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি ও কিছু সংখ্যক সাহাবী নিরাপদে মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করেন। নবীগণের স্বপ্ন যেহেতু ওহী তাই রাসূল (সাঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীর যিক্বাদাহ মাসে পনেরশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। যুলহুলাইফা নামক স্থানে গিয়ে কুরবানীর পশুতে চিহ্ন প্রদান ও সকলে ইহরামের কাজ সমাপ্ত করেন।

যেহেতু সকলের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ জিয়ারত, তাই তারা যুদ্ধের পর্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাননি। কেবল মাত্র একজন মুসাফিরের জন্য যা প্রয়োজন হয়, তাই গিয়েছেন। পথে রাসূল (সাঃ) শুনতে পেলেন যে, মক্কার কাফেররা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমনকি খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে দুইশত দক্ষ যোদ্ধা পথ রোধ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) পথ পরিবর্তন করে একেবারে মক্কার নিকটবর্তী স্থান হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। কুদরতীভাবে রাসূল (সাঃ)-এর উটকে বসিয়ে দেয়া হয়। সাহাবা কেরাম চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন, কার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের নিকট সংবাদ পাঠানো যায় যে, আমরা শুধু বাইতুল্লাহ জিয়ারতের জন্য এসেছি, যুদ্ধের জন্য নয় পরামর্শের সিদ্ধান্ত হল হযরত ওসমান (রাঃ) কে পাঠানোর। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবান বিন সাঈদের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর পয়গাম দিলেন। সকল কাফের সমস্বরে বলে উঠল, এ বছর মুহাম্মদ মক্কায় আসতে দেয়া হবে না। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি একা তাওয়াফ করে যাও। হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, রাসূল

(সাঃ) ব্যতীত আমি একা তাওয়াফ করব না। সকলে মিলে হযরত উসমান (রাঃ)-এর পথ বন্ধ করে রাখল। ঐ দিকে মুসলমানদের মাঝে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) এর নিকট সংবাদ পৌঁছতেই তিনি সমস্ত সাহাবীদের থেকে উসমান হত্যার বদলা নেয়ার জন্য জীবন দেয়ার বায়আত নিলেন, যাকে 'বায়আতে রিযওয়ান' বলে। এ বায়আত কাফেরদের মাঝে ভয় সৃষ্টি করে দিল। তারা হযরত উসমান (রাঃ) কে ছেড়ে দিল এবং সন্ধির জন্য সোহায়েলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। রাসূল (সাঃ) তাদের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করে ফেললেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা 'ফাতহে মুবিন' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) ঐ বছরের মত হোদাইবিয়া নামক স্থানেই কুরবানী করে ইহরাম খুলে ফেললেন। পরিশেষে কোন যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীতই মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

গাযওয়া খাইবার

(৭ম হিজরী মুহাররম মাস)

মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদীরা আশ্রয় নেয় খাইবার নামক স্থানে। সেখান থেকে তারা প্রতিনিয়ত মক্কার কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু করে। সর্বদা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষদরকে উৎসাহিত করত। এতদিন তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা হয়নি। কারণ, এক সাথে দুই পরাশক্তির মোকাবেলা করা আর্থিকভাবে মুসলমানদের সাধ্যের বাইরে ছিল। এখন এক শক্তি কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে খাইবারের ইহুদীরা রয়ে গেছে। সুযোগ এল মুসলমানদের জন্য। এ সুযোগকে গনীমত মনে করে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসূল (সাঃ) ৭ম হিজরীর মহাররম মাসে পনেরশত মুজাহিদ নিয়ে খাইবারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাহাবা কেরাম খাইবার পৌছেন।

তারা গভীর রাত্রিতে পৌঁছেন। রাসূল (সাঃ)-এর সমর নীতি ছিল রাত্রীকালিন অবস্থায় কারো উপর হামলা করা যাবে না। সে কারণে সহাবা কেরাম খাইবারের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সকাল হয়ে গেল। ফজরের আযান শোনা

যায়নি। এবার নবীজি নিশ্চিতভাবে হামলার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন ইহুদীরা বাহিনী দেখে চিৎকার করে বলতে থাকে। محمد والخميس অর্থাৎ মুহাম্মদ সমস্ত বাহিনীসহ উপস্থিত হয়েছেন! চিৎকার করতে করতে সকলেই মজবুত দুর্গে গিয়ে আত্মগোপন করল। রাসূল (সাঃ) একে একে সমস্ত দুর্গগুলোকে জয় করলেন। খাইবার যুদ্ধে বহু গনীমতের মাল অর্জন হয় এবং ইহুদীদেরকে তাদের কৃষি উৎপাদনের এক বিরাট অংশ জিজিয়া দেয়ার শর্তে খাইবরে থাকার অনুমতি দেয়া হয়।

মক্কা বিজয়

(৮ম হিজরী রমজানুল মুবারক)

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, আরবের অন্য কোন গোত্র তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এই দুই পক্ষের (কুরাইশ ও মুসলমান) কোন এক পক্ষের সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে। তখন তাদের সাথেও সন্ধির সমস্ত শর্ত আরোপিত হবে। এ শর্ত অনুযায়ী খোজাআ সম্প্রদায় মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর সম্প্রদায় কুরাইশদের সাথে যোগদান করে। কিন্তু দু' বছর অতিবাহিত না হতেই কুরাইশ তাদের সন্ধি ভঙ্গ করে ফেলে। বনু বকর সম্প্রদায় কুরাইশের পৃষ্টপোষকতায় রাতের আধাঁরে মুসলমানদের আশ্রিত খোজাআ সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করে। বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত খোজাআ গোত্রের চল্লিশজন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে সাহায্যের প্রার্থনা করে। রাসূল (সাঃ) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রথমে রাসূল (সাঃ) একজন দূতকে তিনটি প্রস্তাব দিয়ে কুরাইশদের নিকট পাঠালেন। প্রস্তাব তিনটি হল (১) তোমরা খোজাআ গোত্রের ক্ষতিপূরণে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার কর। না হয় বনু বকর গোত্রের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর। (৩) অন্যথায়, হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা কর। কোরাইশ শেষোক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। দূত মারফত সমস্ত কিছু শুনে রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন, কোরাইশের সাথে যুদ্ধের কোন বিকল্প নেই। তাই তিনি সকলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিলেন। আবু সুফিয়ান ভুল বুঝতে পেরে সন্ধি বহাল রাখার প্রচেষ্টা করলেও রাসূল (সাঃ) তা প্রত্যাখ্যান

করলেন। অতঃপর ৮ম হিজরীর ১০ই রমযান প্রায় ১০ হাজার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হন। এক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) দু'টি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। একটি হল, মদীন থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) মক্কায় হামলার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন এবং মক্কায় যাওয়ার যে পথ রয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে রওয়ানা হন। পরে বহুদূর ঘুরে মক্কার পথে যান। ইতিমধ্যে গোয়েন্দারা মক্কায় সংবাদ পৌছে দেয় যে, রাসূল (সাঃ) শামের দিকে যাচ্ছেন, মক্কা নিরাপদ। দ্বিতীয়ত মক্কার নিকট এসে রাসূল (সাঃ) রাত্রিবেলা আদেশ করলেন, সকলে যেন একটি করে চুলা তৈরী করে এবং তাতে আগুন জ্বালায়। কুরাইশ হঠাৎ এমন মেঘবিহীন বজ্র ও বৃষ্টি দেখে হতবাক তার সাথে আবার এত বিশাল বাহিনী, যাদের রান্নার চুলাই প্রায় দশ হাজার। তারা সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মোকাবেলা থেকে হাত গুটিয়ে নিল। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান দুই সঙ্গীসহ মুসলিম সৈন্য শিবির দেখতে মক্কার বাইরে চলে আসে। এসময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাদের বন্দী করে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করেন। রাসূল (সাঃ) তার দীর্ঘ দিনের শত্রুতা ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমার এ আদেশ দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। রাসূল (সাঃ)-এর বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে নিল। রাসূল (সাঃ) দীর্ঘ আট বছর পর বিনা বাধা ও বিনা রক্তপাতে জন্মভূমি জয়ের মুকুট পরিধান করে মক্কা প্রবেশ করেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে রক্তপাতহীন এত বড় বিজয় আর অর্জন হয়নি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেছে যে, দেশ জয়ের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের তুলনা হয়না। বিনা রক্তপাতে কোন দেশ জয় হয়নি এবং দুনিয়ার ইতিহাসে পরাজিত শত্রুদের প্রতি এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়নি। দীর্ঘ তের বছর রাসূল (সাঃ) সাহাবা কেরাম মক্কায় নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছেন এবং অত্যাচারের কারণে শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি প্রাণপ্রিয় বাইতুল্লাহকে ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু বিজয়বেশে যখন তারা মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তারা তাদের উপর কৃত সকল অন্যায় অত্যাচার ভুলে গিয়ে সাধারণ ক্ষম ঘোষণা করলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর এই ঐতিহাসিক উদারনীতি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধন সৃষ্টি

করল। ঐতিহাসিক মূর বলেন, 'যে মানুষগুলো এতদিন মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করত, তাদের প্রতি এরূপ উদার ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও বিরল ঘটনা।

মক্কা বিজয়ে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হল। গোটা আরবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। বাইতুল্লাহ থেকে মূর্তি সরে গেল। বহুত্ববাদের পূজারী সব একত্ববাদের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল।

গাযওয়া হুনাইন

(৮ম হিজরী শাওয়াল মাস)

মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবে ইসলামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এতদিন কুরাইশদের ভয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পেত, মক্কা বিজয়ের পর তারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এখন বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বাইতুল্লাহর উপর ইসলামের পতাকা দেখে দলে দলে মানুষ কুফ্‌রী ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ছাকীফ এবং হাওয়াযেন গোত্রদ্বয় ছিল খুবই শক্তিশালী। তারা কারো কছে মাথানত করার পাত্র নয়। অতএব, হাওয়াযিন গোত্রের সর্দাররা লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য ময়দানে নেমে আসে। প্রিয়নবী (সাঃ) সংবাদ পেয়ে ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসেন। এ সৈন্য বাহিনীতে নওমুসলিমদের সংখ্যা ছিল অধিক, যারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীরান্দাযীতে ছিল খুব পাকা। তাদের আক্রমণের সামনে প্রথম দফা মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং ময়দানে টিকে থাকা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ) স্বস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন অটলভাবে। তিনি ডান-বাঁয়ের আনসারগণকে ডাক দিলেন। তাঁরা জবাব দিল লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! (হে আল্লাহর রাসূল। আমরা উপস্থিত) তারপর হযরত আব্বাস (রাঃ) উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি সে সকল ব্যক্তি নও, যারা ইসলামের জন্য শপথ করেছিলে? সুতরাং সামনে অগ্রসর হও। এ ঘোষণা শুনামাত্র সাহাবাগণ কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন

এবং প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করেন- যার ফলে কাফেরদের দল ছত্র-ভঙ্গ হয়ে এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ময়দান মুসলমানদের দখলে চলে আসে। কাফেররা পলায়ন করে তায়েফে গিয়ে একত্রিত হয়।

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রচুর গনীমতের মাল অর্জিত হয়। কুরাইশের নও মুসলিমদেরকে অধিকহারে গনীমতের মাল প্রদান করা হয়। ফলে আনসারগণ ভাবে যে, কুরাইশরা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মাতৃভূমির লোক বলে তাদেরকে বেশী করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তাদের এ ধারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা চাও না যে, অন্যরা উট-বকরী নিয়ে যাক আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে যাও?

আনসারগণ একথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠে, আমরা তো এটাই চাই। আমাদের ভয় হচ্ছিল যে, মাতৃভূমির মহব্বতে আপনি আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন। আপনি আমাদের হয়ে গেলে আমাদের আর কোন চাওয়ার নাই। আপনাকে পাওয়াই হবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

গাযওয়া তায়েফ

(৮ম হিজরী শাওয়াল মাস)

হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের লোক হুনাইনে পরাজিত হয়ে দলনেতা মালেক বিন আওফ নফরীর সাথে তায়েফ এসে একত্রিত হয়। তথায় মজবুত দুর্গ, অসংখ্য যুদ্ধ সামগ্রী ও অধিক সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল (সাঃ) সংবাদ পেয়ে স্বীয় সেনাবাহিনী নিয়ে ৮ম হিজরীর শাওয়ালের শেষ দিকে তায়েফ গিয়ে উপস্থিত হন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) সম্মুখ ভাগের সেনাপতি বনু সাকিফ আওতাস নামক স্থানে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করে। কিন্তু পরাজিত হয়ে তায়েফ দুর্গে প্রবেশ করে দূর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। এক বছরের খাদ্যদ্রব্য দুর্গে সঞ্চিত করে। রাসূল (সাঃ) ও মুসলিম বাহিনী দুর্গের নিকট এসে অবস্থান নিলে বনু সাকীফের দক্ষ তীরন্দাজরা প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করে। এতে অনেক মুসলমান আহত ও শহীদ হন। অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে রাসূল (সাঃ) মুসলিম বাহিনীকে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। তায়েফবাসীকে একটানা ১৮দিন অবরোধ করে রাখা হয়। এর মাঝে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম

মিনজানীক ব্যবহার করেন। এ যুদ্ধে সাহাবাগণ দাবাবার ছায়ায় দুর্গের দেওয়ালে অগ্নি সংযোগ এবং দুর্গের দেওয়াল সুড়ং করে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্ট বনু সাকিফ লোহার শলাকাকে আগুনে উত্তপ্ত করে দাবাবার উপর নিক্ষেপ করে। এতে সাহাবাগণ দাবাবার নীচ থেকে বের হলে কয়েকটি তীর এসে সহাবা কেরামদের গায়ে বিদ্ধ হয়। কোন অবস্থাতেই শত্রু পক্ষের শক্তি কমাতে না পেরে এবার রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম তায়েফবাসীর আঙ্গুর বৃক্ষসমূহ কেটে তছনছ করতে শুরু করেন। এবার তারা নত হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল, (আল্লাহর ওয়াসতে) দয়া করে এগুলো কাটবেন না।

তায়েফের ময়দানে ১২ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। তন্মধ্যে ৭ জন কোরাইশ বংশের, ৪ জন আনসারী ও ১ জন বনু লায়েছ গোত্রের। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পক্ষকে পূর্ণরূপে পরাভূত না করেই নবীজি (সাঃ) অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে আসেন।

তাবুক

(৯ম হিজরী রজব)

তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর রজব মাসে রাসূল (সাঃ) মদীনায় অবস্থানকালে সংবাদ পেলেন যে, মূতায় পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের অভাব-অনটনের সুযোগে ইসলাম-মুসলমানদের ধ্বংস করার প্রত্যাশা নিয়ে মদীনা থেকে ২২৪ মাইল দূরে তাবুক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে। রাসূল (সাঃ) কাল বিলম্ব না করেই সাহাবীদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। অবস্থা ভয়াবহ। দুর্ভিক্ষের কারণে গোটা মুসলিম জনপদ ছিল ব্যাপক দারিদ্র-পীড়িত। আবহাওয়া প্রচন্ড উত্তপ্ত, অপরদিকে খেজুর কাটার সময় ছিল সন্নিকটে। সফর ছিল বিশাল লম্বা, বাহন ও আহার্য্যের যোগান দেয়াই কষ্টসাধ্য, তার উপর বিপূল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন। রাসূল (সাঃ) আল্লাহর উপর ভরসা করে জিহাদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে লাগলেন। আত্মত্যাগী সাহাবা কিরামগণ এতে এত বিপুল পরিমাণে সারা দিলেন যে, ইতিপূর্বে কখোনো এরূপ হয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর ঘরের যাবতীয় মালামাল এনে রাসূল (সাঃ)-এর সামনে হাজির করেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর ঘরের অর্ধেক মাল এনে উপস্থিত করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এই যুদ্ধে বিপূল

পরিমাণে দান করেন। তার দানের পরিমাণ ছিল- ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া ভর্তি যুদ্ধ সামগ্রী ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।
সাহাবা কিরামের মধ্যে যারা শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত এবং ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিদের মতো যারা গচ্ছিত মুনাফার মালিক ছিলেন না, তারা সারা দিন গায়ে খেটে যা উপার্জন করত, তার সম্পূর্ণই বিকালে জিহাদের জন্য রাসুল (সাঃ)-এর হাতে তুলে দিতেন। অবশেষে যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ হলে রাসূল (সাঃ) নবম হিজরীর রজব মাসে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ)-কে মদীনার গবর্নর নিযুক্ত করে সমস্ত যুদ্ধ উপযোগী সাহাবীদের নিয়ে রওনা করে তাবুক অভিমুখে। সাহাবাদের বিপুল অংশগ্রহণ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে কাফেররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। রাসূল (সাঃ) সেখানে বিশদিন অবস্থান করে কোন যুদ্ধ ব্যতীতই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মসজিদে জেরার

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে 'যীআওয়ান' নামক স্থানে অবস্থান করলেন, যা মদিনা হতে এক ঘন্টার পথ। হুজুর (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে আনসারদের কিছু লোক রাগের বশীভূত হয়ে মসজিদে কুবার নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করে হুজুর (সাঃ)-এর নিকট অনুনয়-বিনয়ের সাথে অনুরোধ করল যে, আমরা শক্তিহীন ও অপারগদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি, আপনি এ মসজিদে নামাজ পড়িয়ে উদ্বোধন করে দিন। হুজুর (সাঃ) বললেন, আমি এখন সফরে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর তোমাদের মসজিদে নামায পড়ব।
যখন হুজুর (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধ হতে প্রর্ত্যাবর্তন করে 'যিআওয়ান' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা আসল এবং মসজিদে জেরারের প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবগত করালেন। তখন রাসূল (সাঃ) মালেক বিন দুখশুমকে (যিনি বনু সালামা বিন আওফের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা গিয়ে সে অত্যাচারীদের মসজিদ ধ্বংস করে দাও, জ্বলিয়ে দাও। তাঁরা রাসূলের নির্দেশমত খুব দ্রুত বনী সালেম বিন আওফের বসতিতে উপস্থিত হলেন এবং মালেক বিন দুখশুম বললেন, একটু অপেক্ষা কর, আমি বাড়ী হতে আগুন নিয়ে আসছি। (এ গোত্রে মালেকের বাড়ী ছিল।)
একটি বৃক্ষের ঢালে করে আগুন নিয়ে এসে উভয়ে মিলে মুনাফিকদের মসজিদে

জেরার জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেন। মসজিদে উপস্থিত লোকজন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সে মসজিদের নির্মাণকারীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ لَاتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِى بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ, যে ব্যক্তি পূর্ব হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। তুমি কখনও সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন হতে সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। তবে কি এমন ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভীতি এবং সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বীয় ঘরের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায়, যা ধসে পড়বার নিকটবর্তী অতঃপর তা তাকে নিয়ে দোযখে পতিত হয়। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলি চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। -তাওবাহ ঃ ১০৭-১১০

তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে যাঁরা পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ওজর এবং কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-এর অবস্থা ঃ

হুজুর (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধ হতে প্রর্তাবর্তনের পর প্রথমে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দু' রাকা'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর যাঁরা তাবুকের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেনি তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার বিভিন্ন অজুহাত দেখায়। তাঁদের সংখ্যা আশির বেশি ছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁদের সকলের প্রকাশ্য ওজর গ্রহণ করলেন এবং তাদের গোপনীয় বিষয়গুলিকে আল্লাহর সমীপে সোপর্দ করলেন। অতঃপর সকলের বায়আত গ্রহণ করে সবার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

কিন্তু কা'ব বিন মালেক, হেলাল বিন উমাইয়াহ, মুরারাহ ইবনে রবী'-এ তিনজনের তওবা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং ধৈর্য-সহ্যের ঘটনা একটি বিরল উদাহরণ। তাঁরা মিথ্যা ওজর পেশ করা পছন্দ করেননি। সততার কারণে তাদেরকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তবুও তাঁরা সত্যের উপর অটল ছিলেন। অবশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে তাঁদের তওবা কবুল হয়েছে। হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ ও অপরাপর হাদীস গ্রন্থাবলীতে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করছি।

ঘটনার বর্ণনা ঃ হযরত কা'বা বিন মালেক (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম দিলেন। তাঁকে দেখে হুজুর (সাঃ) বললেন, কেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করনি? কা'ব বিন মালেক (রাঃ) স্বয়ং বলেন, আমি উত্তর দিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যদি আমি এই মুহূর্তে কোন দুনিয়াদারের সামনে হতাম, তবে বিভিন্ন টাল-বাহানা ও কথা কাটাকাটি করে রক্ষা পেয়ে যেতাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি জানি যে, যদি আমি এ মুহূর্তে মিথ্যা কথা সাজিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করি, তবে আল্লাহ তাআলা আমার সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ করে আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। যদি আমি সত্য কথা বলি, তবে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। আমার একান্ত বিশ্বাস, আল্লাহ আমার ক্রটি ক্ষমা করে দিবেন আর আপনাকেও আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিবেন।

হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আল্লাহর শপথ, আমার বিলম্ব হওয়ার কোন বিশেষ কারণ ছিলনা। আল্লাহর শপথ, আমি সুস্থও ছিলাম, কোন প্রকার সমস্যা ছিল না। তথাপি আমি পিছনে পড়ে গিয়েছি বিধায় যাওয়া হয়নি। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন- "তুমি যা বলেছে, সত্যই বলেছ। যাও যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক।" তখন আমি বনু সালামের কয়েকজনের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকজন আমাকে বলতে লাগল, "তুমি এ কি করলে? তুমি পূর্বে কোন দোষ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। অন্যান্য লোক যে অজুহাত উপস্থাপন করেছে, তুমিও তো

আজ সে ধরনের অজুহাত উপস্থাপন করতে পারতে। আর তোমার দোষের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট হত"। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমাকে এতবেশী লোকজন বুঝাচ্ছিল যে, আমার মনে চেয়েছিল, তখন আমি একটি অজুহাত বর্ণনা করব এবং প্রথমে যা বর্ণনা করেছিলাম, তা অস্বীকার করব। কিন্তু আমি বিবেচনা করে দেখলাম, আমার অবস্থা ভিন্ন ধরনের।

অতঃপর লোকজন বলল, আরও দুইজন লোক তোমার অনুরূপ ওজর পেশ করেছে। একজন হল মুরারা বিন রবী আমেরী অপরজন হেলাল ইবনে উমাইয়াহ আল ওয়াকেফী।

হযরত কা'বা বিন মালেককে (রাঃ) লোকজন এমন দুইজন লোকের নাম বলল, যাঁরা দুজনই পুণ্যবান ও সত্যবাদী মুসলমানরূপে বিবেচিত ছিলেন। উভয়ই বদরের যুদ্ধের সাথী ছিলেন।

তাঁরা এমন ছিলেন যে, তাঁদের উত্তম আদর্শ সত্যই অনুসরণযোগ্য ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত আমার প্রথম বর্ণনার উপরই আমি দৃঢ় ও নীরব রইলাম।

কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) মুসলমানদেরকে আমাদের তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিশেষ করে দিলেন। লোকজন আমাদের নিকট হতে দূরে সরে যাচ্ছিল। সকলের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি সম্পূর্ণ পরিবেশ আমাদের প্রতিকূল হয়ে গেল। তখন মনে হচ্ছিল যে, এখানকার কেউই আমাদের চিনে না। আমার দুইজন সঙ্গী ঘরে বসে অনবরত ক্রন্দন করছি। আমি বাইরে যেতাম, লোকজনের সাথে মসজিদে নামাজের অংশগ্রহণ করতাম, বাজারে ঘুরাফিরা করতাম, কিন্তু কেউই আমার সাথে কথাবার্তা বলত না। হুজুর (সাঃ) মসজিদে নামাজান্তে বসলে আমি তাঁকে সালাম করতাম। আমি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে নামাজ পড়তাম এবং গোপনে তার প্রতি তাকাতাম। আমি নামাজ পড়তে থাকলে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করতেন। কিন্তু আমি যখন তাঁর প্রতি লক্ষ্য করতাম, তখন তিনি (সাঃ) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, বহুদিন পর একদা আমি শহরের বাইরে আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদাহ (রাঃ)-এর বাগানে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আমি প্রথমে তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহর শপথ, তিনি সালামের উত্তর দেননি। তখন আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহর শপথ দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে, তুমি বল আমি আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে ভালবাসা রাখি কিনা? সে নীরব রইল। আমি তাকে এরূপে তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর সে উত্তরে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক

জ্ঞাত। তখন আমার অশ্রুরাশি গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সেখান হতে ফিরে এলাম।

কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমি একবার মদীনার বাজারে ঘুরাফিরা করছিলাম, এমতাবস্থায় সিরিয়ার একজন বণিক জিজ্ঞাসা করছিল যে, কা'ব বিন মালেক (রাঃ) কোথায়? তারা হঠাৎ আমাকে দেখেই ইঙ্গিতে বলল যে, এই সে ব্যক্তি। লোকটি আমার নিকট এসে গাসসানের বাদশাহর একটি পত্র দিল। যাতে লেখা ছিল-

আম্মা বা'দ! আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের নেতা তোমাদের প্রতি খুব কঠোরতা প্রদর্শন করছেন। অথচ আল্লাহর নিকট তোমাদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তুমি তো এভাবে অবহেলিত হয়ে থাকার পাত্র নও। তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। তখন দেখবে তোমার কেমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমি এই চিঠি পাঠ করার পর বললাম, এ দেখছি আর এক বিপদ। আমি সে চিঠিখানা উনুনে পুড়ে ফেললাম।

এভাবে চল্লিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুজুর (সাঃ)-এর একজন দূত এসে আমাকে বলল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে তালাক দিয়ে দিব, নাকি অন্য নির্দেশ হয়েছে। সে বলল, না কেবল পৃথক থাকার জন্য বলেছেন। তোমার বাকী দুইজন সাথীকেও এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার আত্মীয়দের বাড়িতে চলে যাও। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমার এই ব্যাপারে কোন মীমাংসা না করেন, ততদিন পর্যন্ত সেখানে থাক। এ দিকে হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ (রাঃ)-এর স্ত্রী হুজুর (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ লোক, তার অপর কোন সেবক নেই। যদি আমি তার নিকট হতে দূরে থাকি, তবে তার জীবন বিনাশ হয়ে যাবে। তাই আমি তার খেদমত করব আপনি কি তা পছন্দ করেন।

হুজুর (সাঃ) বললেন, না, তুমি তার খেদমত করাকে আমি অপছন্দ করিনা, তবে মিলন হতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আল্লাহর শপথ, তার এমন কোন স্পৃহা নেই। যখন হতে আপনার নির্দেশ হয়েছে, তখন হতে সে অনবরত ক্রন্দন করছে। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমার কিছুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন আমাকে বলল, যেভাবে হেলাল ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)-এর স্ত্রী অনুমতি নিয়েছে, তুমিও হুজুর (সাঃ)-এর নিকট হতে সেরূপ অনুমতি নিয়ে নাও। তখন আমি বললাম, রাসূল (সাঃ) আমার এই

প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দিয়ে বসেন, তাতে আমার ইতস্তত বোধ হচ্ছে। অপরদিকে আমি এখনও যুবক মানুষ।

তাওবা কবুল ও ক্ষমা

হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেছেন, চল্লিশ দিনের পর আরও দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অর্থাৎ পূর্ণ পঞ্চাশদিনের সুবহে সাদেকের সময় আমি আমার ঘরের ছাদের উপর উপবিষ্ট ছিলাম এবং আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِذَاضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ

যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। -তাওবাহ ঃ ১১৮)

আমি খুবই সংকীর্ণমনা অবস্থায় নিরুপায় হয়ে বসে রইলাম। এমতাবস্থায় আমি শুনতে পেলাম যে, লিসা পাহাড় হতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি উচ্চঃস্বরে বলছে, হে কা'ব বিন মালেক (রাঃ)! তোমার জন্য শুভসংবাদ অবতীর্ণ হয়েছে। তখনই আমি সিজদায় পড়ে গেলাম এবং নিশ্চিত হলাম যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আমি নিষ্কৃতি লাভ করেছি। সম্ভবত ফজরের নামাজের সময় রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আমার তাওবাহ গ্রহণ করার অনুমতি এসেছে। কিছু সময়ের মধ্যেই পর পর কয়েকজন সাহাবা শুভসংবাদ নিয়ে আমার নিকট আসলেন এবং প্রত্যেকেই খুব তাড়াহুড়া করছিলেন। এমনকি কেউ কেউ অশ্বারোহী হয়ে দ্রুত দৌড়িয়ে এসেছেন এবং বিভিন্ন পাহাড়ের দিক থেকে এই সংবাদ দ্রুত আমার নিকট পৌঁছল।

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আমাকে এ শুভসংবাদ প্রদান করে, সে আমার নিকট আসার সাথে সাথে আমার শরীরে আবৃত যে দু'টি কাপড় ছিল সে দুটি কাপড় খুলে আমি তাকে দান করে দিলাম। আল্লাহর শপথ তখন আমার নিকট আর কোন কাপড় ছিলনা। অতঃপর অন্য একজন হতে কাপড় ধার নিয়ে আমি পরিধান করলাম। এর পর আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে চললাম। পথে দলে দলে লোকজন আমাকে তওবা কবুল হওয়ার শুভসংবাদ শুনাচ্ছিল।

দরবারে নববীতে পৌঁছতেই হুজুর (সাঃ) বললেন, হে কা'ব বিন মালেক (রাঃ)! তুমি শুভসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার জীবনে আজকের দিন সবচাইতে কল্যাণকর দিন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এটা কি আপনার পক্ষ হতে না আল্লাহর পক্ষ হতে? তিনি বললেন, আল্লাহর পক্ষ হতে।

উক্ত তেইশটি যুদ্ধে নবী কারীম (সাঃ) স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাছাড়াও আরো তেতাল্লিশটি যুদ্ধে তিনি সরাসরি উপস্থিত না হয়ে সাহাবায়ে কেরামদেরকে ইসলামের দুশমন কাফেরদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। হিজরতের পর হুজুর (সাঃ) মদীনায় দশটি বছর শুধু এ জিহাদী চিন্তা-চেতনায়ই অতিবাহিত করেছেন। গড় হিসেবে প্রতি দু'মাসে একটি করে যুদ্ধ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এক যুদ্ধে-ই দু'মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। হুজুর (সাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে যুদ্ধের ঘোষণা দিতেন ও সাহাবাদেরকে উৎসাহিত করতেন। আল্লাহ্ পাকের আদেশ-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

হে ঈমানদার গণ! তোমরা তোমাদের অস্ত্র ধারণ কর। -নিসা ঃ ৭১

এ আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুজুর (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ মৃত্যু পর্যন্ত অস্ত্র নিয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা অস্ত্রকে নিজের পোশাকের ন্যায় ব্যবহার করতেন। নামাযের সময় অস্ত্র নিয়ে মসজিদে যেতেন। অস্ত্র সকলের সামনে (মিহরাবে) রেখে নামায পড়তেন।

হুজুর (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সুস্পষ্ট আমল সামনে উপস্থাপন করা হলে অনেক দ্বীনদার ব্যক্তির মুখ থেকেই একথা বের হয়ে পড়ে যে, তখনকার পরিস্থিতি আর বর্তমান পরিস্থিতি তো এক নয়। বর্তমান পরিস্থতি আমাদের প্রতিকূলে। অনেকে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বলেই ফেলেন যে, অস্ত্র বহন করা তো সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। তাছাড়া অস্ত্র হাতে নেয়া তো তাওয়াক্কুল এবং তাক্ওয়া পরিপন্থি। আমি ঐসব ভাইদেরকে বলব, দ্বীনের ব্যাপারে কোন মনগড়া কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পরিস্থিতির জ্ঞান সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টারই বেশী। দেড় হাজার বছর পূর্বের পরিস্থিতি আজ থেকে হাজার গুণে প্রতিকূল ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা দুর্বল, মজলুম, অসহায় ও নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর জিহাদের বিধান দিয়ে ঘোষণা করেছেন-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হল তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। -হজ্জ ঃ ৩৯

তখনকার সেই করুণ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি কিয়ামত পর্যন্ত কখনও হবেনা। তখন সাহাবায়ে কেরাম সংখ্যায় অতি নগণ্য ছিলেন। আর অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র সবই ছিল শূন্যের কোঠায়। গুটি কয়েক মুসলমান ধ্বংস হয়ে গেলে সারা দুনিয়াব্যাপী এমন একজন মানুষও ছিলনা যে তাদের জন্য আফ্সোস করবে। এমন কোন সম্পদশালীও ছিলনা যে সামান্য কিছু অর্থ দিয়েও তাদের সাহায্য করবে। তখনকার সেই করুণ পরিস্থিতি এবং প্রতিকূল পরিবেশে তো কোন সাহাবী এ কথা বলে বসে থাকেননি যে, পরিস্থিতি খারাপ এখন জিহাদ করা যাবে না। আগে জনশক্তি ও গণমত তৈরী করো তারপর জিহাদ করবো। বরং সকলেই আল্লাহর আদেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর কর্ম পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রাত্রে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করেছেন আর দিনে যার যা ছিল তা নিয়েই কাফেরদের মোকাবেলায় জিহাদের জন্য মাঠে নেমেছেন। তখন আল্লাহর সাহায্যে তাঁরা শত্রুর মোকাবেলায় খেজুর কান্ডকে তলোয়ার এবং মাটির টুকরোকে এটম বোমা হিসাবে ব্যবহার করেছেন! আসমান থেকে ফেরেশতা এসে তাঁদের সাথে যুদ্ধে সাহায্য করেছে! কারণ, তাঁরা আল্লাহর হুকুম পালনার্থে ময়দানে নেমে পড়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। সাহায্য আসবে এ আশায় ঘরে বসে থাকেননি। যার ফলে বিশাল পরাশক্তি তাঁদের হাতে পরাস্ত হয়েছে।

চিনির তৈরী হাওয়াই মিঠাই দেখতে খুব বড়, কিন্তু হাতে নিয়ে চিপ দিলে আঙ্গুলের চিপায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ যদি তার বড় আকৃতি দেখে ভয় পেয়ে যায় যে, এত বড়টি খাব কি করে, তবে সে সবার কাছে বোকা হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং পরীক্ষায় ফেল করে বসবে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত কাফেরদেরকে এক সাথে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে কাফেরদের আকৃতি আমাদের সামনে বড় করে দেখিয়ে আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

অর্থ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা সবরকারী এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। -মুহাম্মদ ঃ ৩১

উল্লেখিত পরীক্ষা থেকে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। এই পরীক্ষা পূর্ব যুগে হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, যেখানেই মুসলমান কাফেরদের মোকাবেলা করেছে, সেখানেই বাহ্যিকভাবে কাফের মুসলমানদের চেয়ে বহুগুণ বেশী ও প্রতাপশালী হলেও মুসলমানের আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনিতে সব অপশক্তি আঙ্গুলের চিপায় চলে এসেছে। মুসলিম বীর তারিক বিন যিয়াদ (রহঃ) দু' লক্ষাধিক সশস্ত্র কাফের সৈন্যের মোকাবেলায় মাত্র পঁচিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে শত শত মাইল দূর থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্পেনের মাটিতে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন। তিনি ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ কোন পরিস্থিতির পরওয়া করেননি। উম্মতে মুসলিমার গৌরব সতের বছর বয়সী বীর মুহাম্মদ বিন কাসেম (রাহঃ) মাত্র বার হাজার মুজাহিদ নিয়ে রাজা দাহিরের বিশাল হস্তী বাহিনীর মুকাবেলা করেছেন। পরিস্থিতি তো ছিল এই যে, দাহিরের পাহাড়সম হস্তীগুলো দেখে মুজাহিদদের ঘোড়া পিছু নিতে লাগল, অবস্থা প্রতিকুল বলে পরিস্থিতি খারাপে অজুহাত করে বসে থাকেননি বরং ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে দাহিরের হস্তী বাহিনীকে পরাস্ত করে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন এই উপমহাদেশে।

কিছু দিন পূর্বে যখন রাশিয়ার লাল ফৌজ গোটা বিশ্বের ইসলামী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যখন বোখারা থেকে মুসলমানদের খোদার জানাযা পড়ে লাশ ছুড়ে মেরেছিল; তখন তাদের বিরুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা (সমাজে যাদের কোন মূল্যায়ন করা হয়না) বাধার প্রাচীর স্থাপন করেছিলেন। সেদিন তারাও একথা চিন্তা করেননি যে, আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এ বিশাল শক্তির মোকাবেলা করব কিভাবে?

আজ এমনই এক মুহূর্তে আমাদের মাঝে পরিস্থতি খারাপের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, যখন গোটা বিশ্বের পরাশক্তি, আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এবং সমস্ত খনিজ সম্পদের মালিক মুসলমান। যখন সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে ফুৎকার দিলে গোটা তাগুতি শক্তি নিমিষেই তুলার ন্যায় উড়ে যাবে।

আসলে এটা পরিস্থিতির অজুহাতে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করা বৈ কিছুই নয়। স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্যমূলক কিছু চেঁচামেচির কারণে আজ গোটা মুসলিম উম্মাহ দ্বিধা বিভক্ত। বিশ্বজুড়ে আজ মুসলমানরা অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার। কিন্তু মুসলমানদের উপর নির্যাতনের এই চরম মুহূর্তেও অন্য মুসলমানরা বা অন্য সব স্বাধীন রাষ্ট্র এগিয়ে আসছেনা। আজ অবস্থা সেই তিন চোরের ঘটনার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনবন্ধু এক হিন্দু ব্রাহ্মণের বাগানে ফল চুরি করতে গিয়েছিল। তাদের তিনজন তিন ধর্মের। একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টান এবং অপরজন মুসলমান। ব্রাহ্মণ চিন্তা করল, তিন চোরকে এক সাথে শায়েস্তা করা যাবেনা। তাহলে উল্টা নিজেকেই জীবন দিতে হবে। তাই সে ঠান্ডা মাথায় ফন্দি আঁটল যে, প্রথমে তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর শাস্তি। সে বাগানে প্রবেশ করেই হিন্দুকে বলল, তুই তো আমার জাত ভাই। আর খ্রীষ্টান সেও আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করে। তোরা দু'জন আসছিস, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ঐ বেটা মুসলমান কেন আমার বাগানে আসবে ? বলেই মুসলমানকে মারপিট শুরু করল। তাকে আহত করে পাশে ফেলে রেখে এবার হিন্দুকে বলল, তুই আমার জাতি ভাই, তোকে কিছু বলতে পারিনা। কিন্তু খ্রীষ্টান কেন আমাদের হিন্দুদের বাগানে আসবে ? এই বলে খ্রীষ্টানকে কায়দামত শায়েস্তা করল । তাকে শেষ করে এবার এসে হিন্দুকে ধরল । তাকে বলল, তুই আমার জাতি ভাই হয়ে চুরি করতে আসলি কেন ? জানিস না আমাদের ধর্মে চুরি করা মহাপাপ? তারপর তাকেও আচ্ছামত শায়েস্তা করল । এভাবে একে একে তিন জনকে ব্রাহ্মণ একাই শায়েস্তা করে ফেলল । কিন্তু তিন বন্ধু শুরুতে টেরই পেলনা । তারা প্রত্যেকেই মনে করেছিল আমাকে হয়ত কিছুই বলবে না ।

তাই বিশ্ব মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহবান, সময় আছে, এখনও ফিরে আসুন । ঐক্যবদ্ধ ভাবে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন । নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের শিকারে পরিণত হবেন না। তাদের উপহাসের পাত্র হবেন না । তাদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও নিস্পেষণের পৈশাচিক উল্লাসের বস্তু হলেন না। অন্তঃসারশূন্য তাদের এই রাশি রাশি বিত্ত-বৈভব,মণি-মাণিক্য ও পারমাণবিক শক্তির সামনে নিজেদেরকে অসহায় না ভেবে, হীনমন্যতার শিকার না হয়ে, ঐশী মদদের শাশ্বত অঙ্গীকারের প্রতি অনড় অবিচল আস্তা রেখে সম্মুখে পা বাড়ান, সম্মুখসমরে এগিয়ে আসুন । দেখবেন এসব শক্তি খড়-কুটার মত ভেসে যাবে, তাসের ঘরের ন্যায় নিমিষেই ভেঙ্গে যাবে, ফুৎকারে তুলার মত উড়ে যাবে । যেমনটি হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামের বেলায়। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, وان الله على نصرهم لقدير নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে সক্ষম। পরিস্থিতি তাদের জন্য অন্তরায় হতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ, কুরআন-হাদীসের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল হিমাদ্রির মত। ছিল খোদায়ী অঙ্গীকারের প্রতি সুগভীর আস্থা।

দুনিয়া দারুল আসবাব। এখানে আসবাব গ্রহণ করে তার পর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। এক সাহাবী হুজুর (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) উট বেঁধে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব, নাকি না বেঁধে ? হুজুর (সাঃ) বললেন, উট বেঁধে এসে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর । সুতরাং অস্ত্র ধারণ ও বহন তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়। এটি তাওয়াক্কুল-এর সোপান। তাই অস্ত্র হাতে নিয়ে তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। হুজুর (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্র ব্যতীত তাওয়াক্কুল করেননি। স্বয়ং হুজুর (সাঃ) জিহাদের ময়দানে দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন । যুদ্ধের ময়দানে তিনি পনেরটি ঘোড়া, চারটি খচ্চর, দু'টি গাধা, এগারটি তলোয়ার, সাতটি বর্ম, ছয়টি তীর নিক্ষেপ কামান ও দু'টি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেছেন । সায়্যেদুল মুরসালিন একসাথে দু'টি বর্মও পরেছেন । হাদীস শরীফে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখন যদি কেউ এগুলো পরিহার করে তাওয়াক্কুলের দাবী করে, তবে তা হবে বোকামী ও সুন্নত বিরোধী ।

হুজুর (সাঃ)-এর ঘোড়া

১, সাকিব ঃ ঐতিহাসিক ওহুদ যুদ্ধে হুজুর (সাঃ) ব্যবহার করেছেন।

২. মোরতাজা — ৩. লাহীফ্

৪. সাবহা — ৫. ওয়ারাদ

৬. জাবীইস — ৭. মালাওয়াহ্

হুজুর (সাঃ)-এর খচ্চর

১. দুলদুল — ২. ফিজ্জাহ্ — ৩. আইলিয়াহ্

হুজুর (সাঃ)-এর গাধা

১. ইয়াফুর বা আফির

হুজুর (সাঃ)-এর তলোয়ার

১. মাছুর ঃ এটিই তাঁর প্রথম তলোয়ার । এটি তিনি আপন পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন ।

২. আল-আজাব ঃ বদর যুদ্ধে গমনকালে হুজুর (সাঃ) কে হযরত সা'আদ বিন উবাদাহ (রাঃ) এটি হাদিয়া দিয়েছেন।

৩. জুলফিকার ঃ এটি হুজুর (সাঃ)-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তলোয়ার । এটি

আস বিন মুনাব্বাহ নামক জনৈক কাফেরের ছিল। বদরের যুদ্ধে গনীমত হিসেবে এটি হুজুরের হস্তগত হয়। এর হাতল ও খাপ রৌপ্যের নির্মিত
৪. কিলয়ী ঃ এটি কিলায়া নামক স্থান থেকে হুজুর (সাঃ) এর নিকট এসেছে।
৫. বাত্তার ঃ অধিক কর্তনশীল
৬. মাখ্যাম ঃ অধিক কর্তনশীল
৭. রুসূব ঃ শরীরে পূর্ণ প্রবেশকারী
৮. কাজীব ঃ অধিক ধারালো তলোয়ার
৯. সামসাম ঃ অধিক কর্তনশীল শক্ত তলোয়ার। এটি কোনদিন বিন্দু পরিমাণ বাঁকাও হয়নি।
১০. লাহীফ ঃ এটি মধ্যম শ্রেণীর তলোয়ার।

হুজুর (সাঃ)-এর বর্ম

১. যাতুল ফুযূল
২. যাতুল ওয়ীশাহ্
৩. যাতুল হাওয়াশ
৪. আস্ সাদিয়া
৫. ফিজ্জাহ্
৬. বাত্রাহ্
৭. খারনুক
৮. আজইয়াওরা
৯. বাওহা
১০. সুফারাহ্
১১. শাওহাত
১২. কাবতুম
১৩. আস সাদ্দাদ

হুজুর (সাঃ)-এর ঢাল

১. জালুক
২. ফুতুক
৩. মুজাযাহ
৪. জাওকুন

হুজুর (সাঃ)-এর শিরস্ত্রাণ

১. জালিস সুবুগ
২. মাওসূহ্

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবী কারীম (সাঃ) মাত্র দশ বছরে যে পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী ব্যবহার করেছেন, এত অধিক পরিমাণ অন্য কোন সামগ্রী সারা জীবনেও ব্যবহার করেননি। মৃত্যুর সময়ও হুজুর (সাঃ)-এর ঘরে যুদ্ধসামগ্রী ব্যতীত অন্য কোন জিনিস ছিল না। এক হাদীসে হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন-

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري

অর্থাৎ, হযরত আলী ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর পাক (সাঃ) বলেন, আমাকে আমার রিযিক বর্শার ছায়ার নিচে রাখা হয়েছে। যে আমার দ্বীনের বিরোধীতা করবে তার জন্য অপমান অপদস্ততা অবধারিত। -বুখারী ঃ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ঃ ৪০৮
হুজুর (সাঃ) দ্বীনের জন্য, কুরআন হেফাযতের জন্য দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন, মাথা ফাটিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। কাল কিয়ামতের ময়দানে যদি হযরত হামযা (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি (নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা কুরাইশের সর্দার) দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। বার খন্ডে খন্ডিত হয়েছি। যদি হযরত জা'ফর তাইয়্যার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি (নবী (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই) দ্বীনের জন্য উভয় বাহু কাটিয়েছি, গর্দান দিয়েছি তথাপিও ইসলামের পতাকা মাটিতে পড়তে দেইনি। আর তোমাদের সামনে কুরআন ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার প্রিয় নবীকে সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়া হয়েছে, তার প্রতিশোধের জন্য তোমাদের শরীর থেকে ক'ফোঁটা রক্ত ঝরেছে? বেঈমানদের বিরুদ্ধে কয়টি যুদ্ধ হয়েছে? আমরা গর্দান দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা রক্ষা করেছি। আর তোমরা শুধু গলাবাজি করেছ । তোমাদের সামনে কি ছিলনা জিহাদ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো? রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিশাল ভান্ডার? ছিলনা কি আমাদের জ্বলন্ত ইতিহাস? রাসূল (সাঃ) জীবিত থাকতেই আমরা পারিনি শুধু দোয়ার মাধ্যমে, মিষ্টি দাওয়াতে মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে জিহাদের প্রয়োজন হয়েছে, রহমতের নবীর হাতে তলোয়ার নিতে হয়েছে, তিনি তা গ্রহণ করতে তাওয়াক্কুল বা তাকওয়ার পরিপন্থি মনে করেননি। আর তোমরা রিক্ত হস্তে তাকবির দিয়ে, শুধু দাওয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধ-জিহাদ ব্যতীতই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা পোষণ করেছ।

সুধী! নয়ন বুজে গভীরভাবে একটু ভেবে দেখুন, তখন আমরা তাঁদের সামনে কি জবাব দেব? কিভাবে তাদেরকে এই চেহারা প্রদর্শন করবো? সাহাবাদের মাঝে যিনি সবচেয়ে নরম তবিয়তের। ছিলেন তিনি হলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁরও অবস্থা ছিল এরূপ যে, যাকাতের মাস্‌আলাকে কেন্দ্র করে সিংহ বীর ওমর ফারুক (রাঃ) দুর্বলতা সত্যে হুংকার

দিয়ে বলে ছিলেন- أينقص الدين وانا حى "আমি আবু বকর (রাঃ) জীবিত থাকব আর দ্বীনে ইসলামের মাঝে বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে? তা হতে পারেনা।" সেদিন তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরূদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক সেনাদলকেই অভিযানে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে নিম্নবর্ণিত অমূল্য উপদেশগুলো প্রদান করতেন ।

(১) সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় রাখবে। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনকে একই রকম জানেন।

(২) নিজ অধীনগণের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবে।

(৩) সংক্ষিপ্ত উপদেশ দেবে। কারণ, দীর্ঘ কথার অংশ বিশেষ ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক।

(৪) নিজ ভুল সংশোধন করবে তাতে অন্যরা সংশোধিত হবে।

(৫) বিরোধী পক্ষের দূত এলে যথাযথ কদর করবে।

(৬) গোপনীয়তা রক্ষা করবে, যাতে শৃংখলা বিনষ্ট না হয়।

(৭) সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলবে, যাতে সঠিক পরামর্শ পাওয়া যায়।

(৮) সঙ্গীদের সঙ্গে রাতে বৈঠক করবে। ফলে সর্ব প্রকার খবর অবগত হতে পারবে।

(৯) সেনা ছাউনীর পাহারার সুব্যবস্থা করবে। মাঝে মাঝে পাহারাদারীর পরিদর্শন করবে।

(১০) মিথ্যাবাদীর সাহচর্য পরিত্যাগ করবে। সত্যবাদীদের সাহচার্য গ্রহণ করবে।

(১১) যাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করবে। কাপুরুষতা ও খেয়ানত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে।

(১২) কিছু সংখ্যক লোককে দুনিয়া ত্যাগী এবং উপাসনালয়ে অবস্থানকারী দেখবে। বিরক্ত না করে তাদেরকে নিজ অবস্থার উপর চলতে দেবে।

সকল ফেৎনার মূলোৎপাটন এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে জিহাদ করব

যতদিন জমীন থেকে সর্ব প্রকার ফেৎনা সম্পূর্ণ নির্মূল এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া সকল মুসলমানের উপর ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন-

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে আল্লাহর হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। -আনফাল ঃ ৩৯

আয়াতে বর্ণিত দু'টি শব্দ 'ফেৎনা' এবং 'দ্বীন' অতি তাৎপর্যপূর্ণ। আরবী অভিধানে শব্দদ্বয় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. 'দ্বীন' অর্থ ইসলাম ২. 'ফেৎনা' অর্থ কুফুর, শিরক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এ রকম ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। সুতরাং এ অর্থানুযায়ী আয়াতের তাফসীর হবে, সমস্ত মুসলমানকে কাফেরের মোকাবেলায় ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না কুফর-শিরক সমূলে উৎখাত হয়, ইসলাম পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ফেৎনা অর্থ, সে সব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ আপদ, যা মক্কার বুকে কাফের কর্তৃক মুসলমানদের প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয়েছে। আর দ্বীন অর্থ প্রভাব, বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের তাফসীর হবে, মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং বিজয়ের মাধ্যমে জালেমদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

সর্ব প্রকার ফেৎনার অবসান এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত তাদের (কাফের এবং তাদের দোসরদের) সাথে সর্বাত্মক জিহাদ চালিয়ে যাও। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার ভিন্ন)।- বাকারা ঃ ১৯৩

পূর্বোক্ত দু'টি আয়াতের সারর্মম একই যে, ইসলাম বিরোধী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, জিহাদের মাধ্যমে তাদের মূলোৎপাটন কর, ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন কর এবং ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন কর। তাই তো হুজুর (সাঃ) রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ করেছেন এবং এরই মাধ্যমে ইসলামকে ধরার বুকে সকল বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করেছেন।

কেউ হয়তো এ কথা ভেবে ধোঁকায় পতিত হতে পারেন যে, জিহাদের জন্য তো নিয়ত সহীহ এবং ঈমান পাকা হওয়া শর্ত। আর ঈমানে পরিপক্কতা আনার জন্য হুজুর (সাঃ)ও সাহাবায়ে কেরাম মক্কার জীবনে তের বছর মেহনত করেছেন। এখন সে মেহনত ছাড়াই কি ঈমান পাকা হয়ে যাবে ? আর এ অপক্ক ঈমান নিয়েই কি জিহাদ করবো ?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, জিহাদের জন্য ঈমান পাকা ও নিয়ত সঠিক হওয়া শর্ত; যেমন নামাযের জন্য খুশূ-খুজূ ও ইখলাস শর্ত । কিন্তু যদি কারও ইখলাস না থাকে, খুশূ-খুজূ না আসে, তবে কি তার জন্য নামায মাফ? এ ক্ষেত্রে কেউ কি তাকে নামায না পড়ার পরামর্শ দিবে? একথা কি বলবে যে, ইখলাস ও খুশূ-খুজূ তৈরী কর; পরে নামায পড়ো বরং পরামর্শদাতাগণ সকলেই নির্দ্ধিধায় বলে দিবে যে, নামায পড়তে থাক; ইখলাস ও খুশূ-খুজূ আস্তে আস্তে এসে যাবে। জিহাদের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। সারা জীবন ঘরে বসে বসে শুধু জিহাদ জিহাদ করলে ঈমান পাকা হবে না । এর জন্য জিহাদের ময়দানে যেতে হবে। জিহাদের ময়দানে গেলেই জিহাদ করার ঈমান তৈরী হবে।

উল্লেখ্য, হুজুর (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম জন্য মক্কা ভূমিতে তের বছর ঈমান পাকা করার মেহনত করেননি । কারও যদি এই ধরনের বিশ্বাস থেকে থাকে, তাহলে তার প্রতি আহবান থাকবে, নতুনভাবে ঈমান শুধরিয়ে নেয়ার। কারণ, এ বিশ্বাস দ্বারা হুজুর (সাঃ)-এর ঈমানের কমতি ও ঘাটতি সাব্যস্ত হয়। এটা কত বড় জঘন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা একজন অযোগ্য ব্যক্তির উপর নবুয়তের গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছেন। যাকে নবুওত প্রাপ্তির পর মেহনত করে ঈমান পাকা করতে হয়েছে (নাউজু বিল্লাহ)!

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমরে ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মত শতাধিক বড় বড় সাহাবাদের মক্কার বুকে ঈমান পাকা করতে হয়েছে (!) আর হিজরতের পর যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের ঈমান পাকা করার জন্য কোন মেহনতের প্রয়োজন হয়নি? কাঁচা ঈমান নিয়েই তাঁরা জিহাদে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন! এটা একটা চরম বিভ্রান্তিকর কথা ছাড়া আর কিছুই না।

এখনও প্রশ্ন থেকে যায় যে, জিহাদই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম ও সকল কুফ্‌রী শক্তি নিপাতের হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হুজুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে মক্কার জমিনে এত মেহনত কেন করিয়েছেন?

হ্যাঁ, এতে বিভিন্ন রহস্য নিহিত আছে ।

এক. হুজুর (সাঃ)-এর জীবনের প্রথমত দু'টি দিক রয়েছে ১. নবুয়তপূর্ব জীবন । ২. নবুয়ত পরবর্তী জীবন । নবুয়তের পরের জীবন তো হুজুর (সাঃ) কে পাঠানোর মূল লক্ষ্য, উম্মতের জন্য শরীয়তের দলীল । কিন্তু তা মাত্র তেইশ বছর। বাকী চল্লিশ বছর তো নবী প্রেরণের মূল লক্ষ্য নয়, উম্মতের জন্য শরীয়তের দলীলও নয়, তাই বলে কি এ চল্লিশ বছর বেকার? না, বরং এটি পরবর্তী তেইশ বছরের চেয়েও জরুরী । কারণ, পরবর্তী তেইশ বছরের জীবন উম্মতের জন্য শরীয়তের দলীল । আর পূর্ববর্তী চল্লিশ বছর নবী কারীম (সাঃ)-এর জন্য নবুওতীর দলীল । নবুয়তীর দলীল ছাড়া কেউ তাঁকে নবীরূপেই বিশ্বাস করবেনা। আমল তো বহু পরে । নবী কারীম (সাঃ)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে হাজারো অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যেমন ঃ মেঘমালা ছায়া দেয়া, বৃক্ষ সেজদা করা, পাথর সালাম দেয়া, কোন দিন মিথ্যা না বলার কারণে কাফের কর্তৃক আল-আমীন উপাধি দেয়া ইত্যাদি সবই নবীর জন্য নবুয়তের দলীল। এরপর আসুন নবুয়ত পরবর্তী জীবন। এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। ১. মাক্কী। ২. মাদানী। মদীনার দশ বছরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) আগমনের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। সকল বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম বিজয়ী হয়েছে জিহাদ তথা তলোয়ারের মধ্যেমে । দয়াল নবী রহমতের সাগর কি এমনিতেই তলোয়ার হাতে নিয়েছেন ? না, বরং মক্কার তেরটি বছর ঘরে ঘরে গিয়ে মধুর ভাষায় বুঝিয়েছেন। তায়েফে মার খেয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। তারপর অপারগ ডাক্তারের ন্যায় অপারেশনের জন্য অস্ত্র হাতে নিলেন। এখন কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, হুজুর (সাঃ) ভাল করে বুঝালেই হত, যুদ্ধের কোন প্রয়োজন ছিল না।

দুই. হুজুর (সাঃ)-এর দোয়ার ভাষায়ই বুঝা যায় যে, তিনি কেন তের বছর মেহনত করেছেন। পাপিষ্ঠ কাফেরদের নির্যাতনের চরম মুহূর্তেও হুজুর (সাঃ) দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব বা ওমর ইবনে হিশাম (আবু জাহেল) কে ইসলামের আলোক বর্তিকা দান করে ইসলামকে শক্তিশালী কর ।

তিন. ইসলাম যে শুধু উদারতা, দয়ার মাধ্যমে আসেনি বরং সমস্ত কিছুর মূলে তলোয়ার থাকা জরুরী। কারণ, যার শক্তি নেই, তার উদারতার কোন মূল্য নেই ।

চার. হিজরত পরবর্তী তথা মাদানী জীবনে যুদ্ধ-বিগ্রহের বড় বড় কুরবানী যাতে মুসলমানদের ভড়কে যাওয়ার কারণ না হয় সে জন্যই মাক্কী জীবনে এর পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

পাঁচ. উম্মতকে এটা শিক্ষা দেয়ার জন্য যে, নবী কারীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে আজমায়ীনগণ সকর প্রকার প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও সম্মুখে এগিয়ে গেছেন । সুতরাং তোমাদের পিছপা হওয়ার কোনই অবকাশ নেই ।

জালেমদের হাত থেকে মজলুমদের মুক্ত করার জন্য জিহাদ করব

নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত মজলুম মুসলিম জনতাকে অত্যাচারীর উৎপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ করা অন্য মুসলমানদের উপর ফরযে আইন। চাই সে নির্যাতন ক্ষেত্র পৃথিবীর যেথাই হোক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করছ না; দুর্বল সেই-পুরুষ-নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা আর্তচিৎকার করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দাও, এখানকার অধিবাসীরা অত্যাচারী । আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ওয়ালী (পক্ষাবলম্বন কারী) নির্ধারণ করে দাও এবং নির্ধারণ করে দাও তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী। -নিসা ঃ ৭৫

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় কিতালের নির্দেশ দানের পরিবর্তে সতর্কবাণী ব্যবহার করেছেন 'তোমাদের কি হল? বলে। কারণ, যখন কোন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার উপর নির্যাতন হতে থাকে; আর সেখানকার মুসলমানরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকে, এমত পরিস্থিতিতে যারা কিতাল থেকে বিরত থাকে, তারা ধমকেরই উপযুক্ত । কারণ শরীরের একটি অঙ্গ আহত হলে অপর অঙ্গকে ব্যথিত হওয়ার জন্য তাশকিল বা আহবান করতে হয় না। একটি অঙ্গে ব্যথা হলে পুরো দেহটাই ব্যথিত হয়ে পরে । যেমন, চোখে ব্যথা হলে পাকে অনুরোধ করতে হয় না ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য। ব্যথার কারন বর্ণনা দিতে মুখকে শিখিয়ে দিতে হয় না। তদ্রূপ সারা দুনিয়ার মুসলমান একটি শরীরের ন্যায়। পৃথিবীর এক প্রান্তে একজন মুসলমানের উপর কোন আঘাত আসলে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জান দিয়ে হলেও তাকে উদ্ধার করতে হবে। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اَلْمُسْلِمُ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

অর্থাৎ- মুসলিম জাতি এক শরীরের ন্যায় । তার চোখে ব্যথা হলে সমস্ত শরীর ব্যথিত হয়ে পড়ে । (এ ভাবে একজন মুসলমানের গায়ে টোকা এলেও সকল মুসলমানের ব্যথিত হওয়া আবশ্যক ।)

হুজুর (সাঃ) শুধু হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি । বরং তাঁর বাস্তব জীবনে আমলের মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, মুসলমানের রক্তের বদলা কিভাবে গ্রহণ করতে হয় । ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসের শুরুর দিকে নবী কারীম

(সাঃ) বাইতুল্লাহ যিয়ারতের বাসনা নিয়ে এহরাম বাঁধলেন। ১৪/১৫ শ' সাহাবার বিরাট একটি জামায়াত তাঁর সফর সঙ্গী হলেন। মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নিকট নবী কারীম (সাঃ) যাত্রা বিরতি করলেন। এরপর পরামর্শসভা ডাকলেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হুজুর (সাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-কে মক্কার কুরাইশদের নিকট এই মর্মে সংবাদ দিয়ে পাঠালেন যে, রাসূল্লাহ (সাঃ) শুধু বাইতুল্লাহ যিয়ারত ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) হুজুর (সাঃ)-এর বার্তা নিয়ে মক্কায় গেলেন। কুরাইশ নেতারা তাঁকে সেখানে আটক করল। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে। এই দুঃসংবাদ নবী কারীম (সাঃ)-এর নিকটও পৌছল। তখন হুজুর (সাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং প্রতিশোধের জন্য গর্জে উঠে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন-

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَاُقَاتِلَنَّهُمْ عَلٰى اَمْرِيْ هٰذَا حَتّٰى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِيْ

যে মহান আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আমার গর্দান শরীর থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে।
তখন দয়াল নবীর চেহারা থেকে ক্রোধের অগ্নি ঝরছিল। বাব্‌ল বৃক্ষের নীচে বসে তিনি আপন হাত প্রসারিত করে দিলেন। সকল সাহাবী তাঁর হাতে হাত রেখে জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিলেন। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল-

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا # عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

আমরা সবাই বাই'আত হচ্ছি প্রিয়নবীর হাতে
মরণপণ জিহাদ চালিয়ে যাব খুন থাকবে যতক্ষণ ধমনিতে।
হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল যে, হুদায়বিয়ায় আপনাদের থেকে নবী কারীম (সাঃ) কোন্ বিষয়ে বাই'আত নিয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন على الموت 'মৃত্যুর' শপথ নেয়া হয়েছে। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খুনের বদলা নেয়ার জন্য। সাহাবায়ে কেরামদের সেই বাই'আতের তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

যারা আপনার কাছে জীবন দানের শপথ করে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছে শপথ করে। আল্লাহর (কুদরতী) হাত তাদের হাতের উপর ছিল। -ফাতাহ ঃ ১০

বাই'আতকারীদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ কারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করেছিল। -ফাত্হ ঃ ১৮

চিন্তার বিষয় যে, একটি মাত্র জানের বদলা নেয়ার জন্য দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এমনকি দু'জাহানের বাদশাহ রাসূল (সাঃ)ও জীবন দেয়ার শপথ করেছেন! একজন মুসলমানের জীবন রক্ষার জন্য শত শত মুসলমান অকাতরে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন । মুসলিম জাতি যতদিন এ শিক্ষার উপর ছিল, যতদিন তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের চেতনা ও অনুভূতি ছিল; ইতিহাস সাক্ষী, ততদিন তারা বিশ্বের বুকে ইজ্জতের সাথে, বিজয়ীবেশে জীবন যাপন করেছে । আজ মুসলমানদের সেই চেতনা নেই বলে সর্বত্র তারা নির্যাতন নিপীড়নের শিকার । আজ কোথাও কোন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নির্যাতনের কবলে পড়লে, সন্ত্রাসীদের গ্রাসী থাবায় ছন্নছাড়া হলে বা কোন জালেম গোষ্ঠীর নিস্পেষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হলেও বাকীরা ভাবে, আমাদের উপর তো কোন ঝাপটা আসেনি! আমরা তো দিব্যি আরামেই আছি ! এটাই কি কুরআনের শিক্ষা ? রাসূলের আদর্শ ? পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ? না কখনো না। হতে পারে না । তারা তো কোথাও মজলুমের আহাজারি শুনলে, কোথাও জালেম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে ক্ষিপ্রগতিতে সেখানে ছুটে যেতেন, জালেমের শিরশ্ছেদ করে মজলুমের হেফাযত করতেন ।

প্রমাণের জন্য বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই । ভারতের দেবল বন্দরের কথাই বলছি । সেখানে রাজা দাহির-এর হাতে নির্যাতিত হয়েছিল এক মুসলিম যুবতী । সেই নির্যাতিতা নাহিদার শরীরের রক্ত দিয়ে লেখা আর্তনাদবার্তা পৌছেছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে। হাজ্জাজ গর্জে উঠলেন । তৎক্ষণাৎ মুক্তি বাহিনী পাঠালেন দেবলের উদ্দেশ্যে । পর পর দু'টি বাহিনী পরাজয়ের পর ইসলামী ইতিহাসের নক্ষত্র, সিংহ পুরুষ, হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সতের বছরের যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন, যারা একজন নারীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে সুদূর ইরাক থেকে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসে ভারতে রাজা দাহিরের পতন ঘটিয়ে র্নিযাতিতা বোনের সাহায্য করেছেন এবং উপমহাদেশে সর্ব প্রথম ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কিন্তু আজ যখন নিপীড়িত মানবতার গগনবিদারী আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, যখন কাশ্মীরে মুসলিম বন্দীদের মুখে পানির

পরিবর্তে পেশাব ঢালা হচ্ছে । গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করে আছড়িয়ে মারা হচ্ছে । মুসলিম মা-বোনেরা ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিচ্ছে । এখন কোথায় খালেদ বিন ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তপ্ত রক্তের ধারক যুব সমাজ ? তোমাদের তরবারী কি ভোঁতা হয়ে গেছে? তোমরা কি ঘুমিয়ে পড়েছ? আজ তোমরা লক্ষ যুবক জীবিত থাকতে কি করে সেই নর পিচাশরা তোমাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। আজ যদি তারা তোমাদের গর্ভধারিনী মা হতো, আপন বোন হতো তবে, কি সম্ভব হতো নীরবে বসে থাকা? তারা কি তোমাদের ধর্মীয় মা-বোন নয়? তাহলে তাদের প্রতি কেন এত উদাসীনতা? এর জন্য কি তোমাদের আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে না?

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে চিন্তাশীল সমাজের অনেকেই ভাবছেন যে,বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরয হয়েছে কিনা? যদি হয়, তবে তা কোন্ প্রকারের ? ইত্যাকার আরো নানা প্রশ্ন তাদেরকে তাড়িত করছে ।

বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ, তাই এর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

জিহাদ দু' প্রকার। এক. ইক্বদামী । দুই. দিফায়ী ।

ইক্বদামী ঃ অর্থ আক্রমণাত্মক জিহাদ । ইসলামের আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে যে স্থানগুলো একবার মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে, সে গুলোতে ইজ্জতের সাথে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী খেলাফত চলতে থাকলে, ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কারো পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সংবাদ না আসলে, কাফেররা তাদের রাষ্ট্রে (যা কোনদিন মুসলমানদের আয়ত্বে ছিলনা ।) তাদের ধর্ম পালন করলে অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের বশ্যতা শিকার করে থাকলে, মুসলমানদের উপর হামলা তো দূরের কথা কোন একটি সাধারণ কাজের প্রতিও খারাপ নজরে তাকানোর সাহস না পেলে, এমতাবস্থায় কাফেরদের মাঝে সর্বদা ভীতি পুঞ্জীভূত করে রাখার জন্য (যাতে কখনোও সুযোগ পেয়েও মুসলমানদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানোর হিম্মত না হয়) বছরে দু'-এক বার বিনা উস্কানিতেই কাফের রাষ্ট্রে হামলা করা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মু'মিনীনের উপর ওয়াজিব। কারণ, কাফেররা কখনো মুসলমানদের শান্তিতে বসবাস সহ্য করতে পারে না। তারা সব সময়ই মুসলমানদের অসর্তকতার সন্ধানে থাকে । তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة

কাফেররা চায় যে, তোমরা (মুসলমানরা) কোনরূপে অস্ত্র থেকে অসতর্ক থাক, যাতে তারা এক যোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। -নিসা ঃ ১০২

কাফেররা মুখে মুখে বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশ করলেও অন্তরে সর্বদা মুসলমানদের অমঙ্গল চায়। তাই তাদের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে উঠে। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে, তা আরো অনেক বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলাম, যদি তোমরা তা অনুধাবন কর। আলে ইমরান ঃ ১১৮

এ সমস্ত আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, কাফেররা কখনো নীরবে বসে থাকে না। তারা সর্বদা মুসলমানদের অমঙ্গল সাধনেরই চেষ্টা করে। তাই বছরে দু'-এক বার হামলা করে তাদের শক্তি দমিয়ে রাখতে হয়। অন্যথায় সুযোগ পেলেই বাদশাহ হারুনুর রশীদের বানরের মত ইসলাম ও মুসলমানদের মাথায় চড়ে বসবে।

হারুনুর রশীদের বানরের ঘটনা

বাদশাহ হারুনুর রশীদ শখ করে খুব সুন্দর একটি বানর লালন করতেন। আদর করে প্রত্যহ তাকে সাবান দিয়ে গোসল করাতেন। উন্নত মানের আহার দিতেন। প্রত্যহ প্রভাতে বাদশাহ্ দরবারে উপস্থিত হলে বানরটি তাঁর নিকট আসত। বাদশাহ তাকে একটি করে টাকা দিতেন আর সাথে একটি করে বেত্রাঘাত করতেন। বেত্রাঘাত খেয়ে বানরটি চেঁচিয়ে দরবার ত্যাগ করত। প্রতিদিনের ঘটনায় পারিষদদের মাঝে কৌতূহল সৃষ্টি হল যে, কেন বাদশাহ প্রতিদিন বানরটিকে এভাবে টাকা দেন আর সাথে একটি করে বেত্রাঘাতও করেন!

একদিন চাপা কৌতূহলের বিস্ফোরণ ঘটল। সবাই সম্মিলিতভাবে বাদশাহকে প্রশ্ন করে বসল, জাঁহাপনা! আপনি বানরটিকে এত আদর করেন, টাকা দেন; কিন্তু সাথে একটি করে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে কষ্ট দেন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর বাদশাহ মুখে না দিয়ে কাজের মাধ্যমে দিতে চাইলেন। পরদিন দরবারে বসার সময় বাদশাহ সিংহাসনের কাছ থেকে বেতটি সরিয়ে রাখলেন। নিয়মানুযায়ী বানরটি এল। বাদশাহ তাকে টাকা দিলেন, কিন্তু বেত্রাঘাত করলেন না। ফলে বানর সিংহাসনের চারো পাশে ঘুরে ফিরে এসে সিংহাসনে উঠে বসল। বাদশাহ কিছুই বললেন না। সেদিন এভাবে গেল। পরদিনও বাদশাহ তার সাথে একই আচরণ করলেন। ফলে সে লাফ দিয়ে বাদশাহর ঘাড়ে উঠে বসল। অবস্থা দেখে মন্ত্রীবর্গ সহজেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।

ইক্বদামী জিহাদ ঠিক তদ্রূপ। এক্ষেত্রে মনে হয়, যেন মুসলমানরা কাফেরের উপর জুলুম করছে, কিন্তু তা জুলুম নয়। তাছাড়া কোন চাকর যদি মনীবের অবাধ্যতা করে, তবে সবাই তার শাস্তির ব্যবস্থা করে। কেউ দয়া করে শাস্তি দিতে না চাইলে অন্যরা তাকে উদ্বুদ্ধ করে। দুনিয়ার কেউ অবাধ্য চাকরকে শাস্তি দেয়া বা চাকরি থেকে বাদ দেয়াকে জুলুম মনে করে না। তাহলে যে আহকামুল হাকেমীন আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য্য সব কিছু দিয়ে মানবজাতিকে লালন করছেন, তার অবাধ্যকে শাস্তি দেয়া কি জুলুম হবে ? ঐ সমস্ত অবাধ্যদের শাস্তি হল হত্যা, যা মুসলমানদের হাতে প্রদান করা হবে। এর আলোচনা সামনে আসবে ইন্‌শা আল্লাহ্।

দিফায়ী ঃ অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক জিহাদ । এ প্রকার জিহাদ বিশ্বের কোন এক প্রান্তে যদি কোন মুসলমানের উপর নির্যাতন করা হয়, মুসলমানদের এক ইঞ্চি জমিনও যদি কাফেররা জবর দখল করে, তাহলে মজলুমকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করা এবং ঐ জমিন কাফেরের হাত থেকে উদ্ধার করা পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের উপর ফরযে আইন। এমতাবস্থায় (যখন কাফের কোন মুসলমানের উপর নিপীড়ন করে বা মুসলমানের জমি দখল করে) গোলাম তার মনীবের, স্ত্রী তার স্বামীর এবং ছাত্র তার উস্তাদের অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই । একজন অবুঝ শিশু বা অন্ধ লোক আগুনে বা পানিতে পড়তে থাকলে যেমন তাকে উদ্বার করার জন্য কোন আমীরের আদেশের প্রয়োজন হয় না, ডাকাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ডাকাতকে হত্যা করার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন হয় না, আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশেরও কোন প্রয়োজন

পড়েনা, ঠিক তদ্রূপ কুরআনের অবমাননাকারী ও রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা ক্ষুন্নকারীদের হত্যার জন্যও আমীরুল মু'মিনীনের আদেশের প্রয়োজন হয় না।
একদা বিশিন নামক এক মুনাফিকের সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে এক ইহুদীর ঝগড়া হল । এর সমাধানের জন্য উভয়ই হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে মুকাদ্দামা দায়ের করল । মুনাফেকের অন্তরে আনন্দ ছিল যে, আমি তো মুসলমান, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গ্রুপের লোক, তার পিছনে নামায পড়ি। ফায়সালা তো আমার পক্ষেই হবে । কিন্তু ইহুদী দাবীতে সত্যবাদী ছিল। তাই হুজুর (সাঃ)-এর ফয়সালা ইহুদীর পক্ষে হল। এতে মুনাফিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল, এবং মনে মনে হুজুর (সাঃ)কে ভর্ৎসনা করতে করতে ইহুদীকে বলল, চল! আমরা ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাছে আপীল করব । তিনি সঠিক বিচার করবেন । মুনাফিকের ধারণা, ওমর ফারুক (রাঃ) তো কাফেরের ব্যাপারে কঠোর । তার কাছে গেলে অবশ্যই আমার পক্ষে ফয়সালা হবে । তারা ওমর ফারুক (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আপিল করলো। হযরত ওমর (রাঃ) উভয়ের বক্তব্য শোনার সিদ্ধান্ত নিলেন । বক্তব্য শুরু হল । ইহুদী তার বক্তব্যের শুরুতে বলল, হে ওমর ! এটি বিচার নয়, আপিল । ইতিপূর্বে আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দরবারে গিয়েছিলাম। তিনি আমার পক্ষে ফয়সালা করেছেন । সে বিচার তার মনঃপূত হয়নি বলে সে আপনার নিকট আপীল করতে এসেছে । হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বিশিরকে জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদীর কথা কি সত্য ? বিশির বলল, হ্যাঁ । তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তবে পুনরায় আমার নিকট কেন ? মুনাফিক বলল, আমি হুজুর (সাঃ) নরম দিলের মানুষ । তিনি ভালভাবে লক্ষ করেননি যে, সে ইহুদী আর আমি মুসলমান। হুজুর (সাঃ)-এর পিছনে নামায পড়ি, জিহাদেও যাই । এতদসত্ত্বেও তিনি আমার বিরুদ্ধে ফয়সালা দিলেন । আশা করি, আপনি সঠিক বিচার করবেন । হযরত ওমর (রাঃ) বিষয়টি বুঝতে পেরে বললেন, তোমরা বস, আমি আসছি। এ কথা বলে তিনি ঘরে গিয়ে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং বললেন, ‘‘রাসূল (সাঃ)-এর বিচারে যার অন্তর সন্তুষ্ট হয় না; পুনরায় বিচারের প্রয়োজন হয়, তার ফয়সালা এই’’ বলেই এক আঘাতে মুনাফিককে হত্যা করে ফেললেন । তখন সারা মদীনায় গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, ওমর (রাঃ) মুসলমানকে হত্যা করেছেন । ফলে হুজুর (সাঃ) পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং মনে মনে দিয়াত গ্রহণের কথা ভাবছিলেন । এমন সময় আল্লাহ তা'আলা ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে আয়াত নাযিল করলেন । ইরশাদ হল-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতিও। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। -নিসা ঃ ৬০

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফ্‌তী শফী সাহেব (রাহঃ) তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে লিখেন যে, যখন কোন মুনাফিক হুজুর (সাঃ)-এর ফায়সালা অমান্য করে, তখন তার মুনাফিকী গোপন থাকেনা। সে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যে মুরতাদকে হত্যা করেছেন, তাঁর স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। নবীর একটি হুকুম অমান্য করাই মুরতাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর মুরতাদকে হত্যা করার জন্য কোন আমীরের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। নবীর পিছনে নামায আদায় করা সত্ত্বেও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা ব্যতীতই মুরতাদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন। হুজুর (সাঃ)ও হযরত ওমর (রাঃ) কে সতর্ক করেননি যে, তুমি কেন তাকে হত্যা করলে? তাকে তো বুঝালেই হত। আজ তো মুরতাদে মুরতাদে গোটা বিশ্ব ছেয়ে গেছে। শুধু রাসূল (রাঃ)-এর আদেশ অমান্যই নয়, তাঁকে সন্ত্রাসী বলেও গালি দিচ্ছে, সুন্নাতকে পদদলিত করা হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। টুপি-পাগড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। আর তথাকথিত আশেকে রাসূলের (সাঃ) দাবীদাররা ফতোয়া তালাশ করছে যে, হত্যা জায়েয হবে কি না? বাহানা তালাশ করে বেড়াচ্ছে, পরিস্থিতি খারাপ, যোগ্য আমীর নেই ইত্যাদি বলে। দেশের পরিস্থিতি সর্বদা জিহাদ বিরোধী থাকবেই। তাকে উপযোগী করে নিতে হবে মুসলমানদের। কোন খ্রীষ্টান, এন,জি,ও বা হিন্দু কাফের জিহাদের পরিস্থিতি কায়েম করে দিবে না। অস্ত্র যোগান দিবে না। মুসলমানগণ বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামদেরকে নিজেদের মাঝে আমীর নির্ধারণ করে জিহাদের ঘোষণা দিতে হবে। যেমনটি করেছিলেন আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ।

বিশ্ব মুসলমানের নির্যাতনের পরিস্থিতি তুলে ধরতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থের আকার নিবে। তাই শুধু সচেতন মুসলমানদের জ্ঞাতার্থে অতি সামান্য তথ্য তুলে ধরছি। যাতে তারা একে সম্বল করে অসচেতনদের মাঝেও চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারে।

কাশ্মীরের করুণ অবস্থা

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর অর্ধশত-বছর ধরে অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে। কাশ্মীরী ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের উপর ভারতীয় মালাউনরা নির্মমভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছে। রক্তপিপাসু মালাউনরা মুসলমানদের রক্ত শোষণ করার নেশায় মেতে উঠেছে। তারা কাশ্মীরী মুসলমানদের গণহত্যা করছে। ক্রেকডাউনের নামে মুসলিম যুবকদের খতম করে দিচ্ছে। অস্ত্র ও ক্ষমতাবলে ভারত তার আট লক্ষ্য হিংস্র সামরিক জান্তা দ্বারা কাশ্মীরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ও মাতৃজাতির সম্ভ্রম বিনষ্টের মাধ্যমে যে লোমহর্ষক ইতিহাসের সূচনা করেছে, তা গোটা বিশ্ব মুসলিমের বিবেককে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। কাশ্মীরের নির্যাতনের কাহিনী নতুন কোন বিষয় নয়। গণতন্ত্রের দাবীদার ভারত জাতিসংঘের গণভোটের প্রস্তাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে জবর দখল অব্যাহত রেখেছে। অব্যাহত রেখেছে মুসলিমশূন্য কাশ্মীর স্থাপনের হীন পরিকল্পনা। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর, স্বর্গ হারিয়ে জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়েছে। পর্যটকদের হৃদয় জুড়ানো নয়নকাড়া কাশ্মীর ভারতীয় বর্বর দখলদার বাহিনীর কলংকিত পদভাবে এখন নিস্প্রাণ। কাশ্মীরের রাজপথে এখনো প্রতিনিয়ত মানুষের রক্ত ঝরছে। চারদিকে হাহাকার, পশুবৃত্তির তাণ্ডবে মানবতা আজ বিপন্ন। স্বজনহারা শত শত অসহায় বনি আদমের আর্তনাদে কাশ্মীরের বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। কাশ্মীর বিরোধ নিয়ে জাতিসংঘে যাওয়া যাবে না। সার্ক সম্মেলনেও তোলা যাবে না। এ হচ্ছে ভারতের চানক্যনীতি। এই নীতি আর কতদিন চলবে? ভারতের এক গুয়েমির কি অবসান হবে না? বিরোধ যত দীর্ঘস্থায়ী হোক, তারও একটা শেষ আছে। কাশ্মীর বিরোধের বয়স ৫০ বছর। এর মধ্যে মীমাংসা হয়নি বলে ভবিষ্যতেও যে তা হবেনা এটা বলা যাবে না। কারণ, শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। দীর্ঘ ১৯০ বছর পর ভারতবর্ষ বৃটিশের কাছ থেকে স্বধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন ওলামায়ে কেরাম। এতে শহীদ হয়েছেন পাঁচ লক্ষাধিক জানবাজ মুসলমান। কাশ্মীরীদের রক্ত বৃথা যাবে না। তারা একদিন ভারতীয় পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে মাথা উচুঁ করে দাড়াবেই। ইনশা আল্লাহ।

তার জন্য প্রয়োজন আফগান জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে 'হয় স্বাধীনতা না হয় শাহাদাত' এ প্রেরণায় দুর্বার

গতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

রক্তাক্ত গুজরাট

এক কালের সুখী সমৃদ্ধ গুজরাটবাসী আজ মানবতার ঘোর শত্রু হিটলারের নাজী ক্যাম্পের চেয়েও ভয়াবহ এক কারাগার। হালাকু খান, চেঙ্গিস খান মুসোলিনের চেয়েও নিষ্ঠুর একদল মুসলিম রক্তপিপাসু নর পিশাচের হাতে বন্দী। বর্তমান হিন্দু উগ্রবাদী মালাউনদের কাছে মুসলিম হওয়াটাই যেন মহাপাপ। সম্প্রতি গুজরাট মুসলমানদের ইতিহাস হিমালয়সম বেদনা ও দুঃখের ইতিহাস, বুকভরা কান্নার ইতিহাস। দিবস রবি অস্তমিত হতে দেরী; কিন্তু মালাউনদের মুসলিম জনপদে হাজারো অকথ্য নির্যাতন চালাতে দেরী নেই। যেন এটাই তাদের পেশা ও নেশা। কয়েক মাসে আঠারো হাজারের অধিক মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে বষ্ম করে ফেলে। রাতের আঁধারে, ঘুমন্ত অবস্থায়, বাড়ীর চারপাশে পেট্রোল দিয়ে আগুন দেয়ার মত ঘটনা হয়েছে হাজারো। দু'হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েও নিস্তার পায়নি অসহায় মুসলমান। পাথরের আঘাতে থেৎলে দেয়া হয়েছে গোটা দেহ ও মস্তিষ্ক। মাদ্রাসা ও মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে অসংখ্য। নির্যাতনের এমনই অবস্থা হয়েছে যে, পরিদর্শন সাংবাদিকগণ প্রত্যক্ষ করে স্থির থাকতে পারেনি। কেউ অজ্ঞান হয়েছে। কেউবা হার্ট এটাক করে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। কেউবা মন্তব্য করেছে, বিশ্ব ইতিহাসে এমন নির্যাতন কখনো দেখিনি, কখনো শুনিনি।

হৃদয়বিদারক গুজরাট ঘটনা সকল পত্র-পত্রিকায় ছাপা হল। কিন্তু কোন মানবাধিকার সংস্থার কান দিয়ে যেন পানি ঢুকল না। সকলেই নীরব নিস্তব্দ। এমনকি মুসলমানদরে মাঝেও দরদীদের মুখ বন্ধ হয়েছিল বিভিন্ন প্রলোভন ও বহু প্রত্যাশায়। হায়! আফসোস, হায় মুসলিম ভ্রাতৃত্ব!

আরাকানীদের আর্তনাদ

চলতি শতকের নির্মম নির্যাতনের শিকার বার্মার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল আরাকান। প্রতিদিন কি ঘটছে আরাকানে? কেমন আছে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানরা? কে তার খবর রাখে? একদিন স্বাধীনচেতা, ধর্মভীরু মুসলমানগুলো আজ ধর্মীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা ও ব্যবসা বাণিজ্যে বৈষম্যের শিকার। দিনে সামরিক জান্তাদের নির্যাতনের শিকার আর রাতের আঁধারে বর্মী দস্যু ও মগ গুন্ডাদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের শিকার। মুসলমানদের শ্রমে করা কৃষি ফসল কাটার সময় হলে নিয়ে যায় সামরিক জান্তারা। মুসলিম যুবতীদের সামরিক ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য বাধ্য করে আপন পিতাকে। মসজি-মাদ্রাসা থেকে বিরত রাখে মুসলমানদের অস্ত্রের মুখে, রাজ্যের একই জিনিস বৌদ্ধদের জন্য একদা মুসলমানদের জন্য তার দশগুণ দাম।

কেমন যেন এক 'মঘের মুল্লুকে' পরিণত হয়েছে আরাকান।

আরাকানের বর্তমান পরিস্থিতি চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাবে রামু থেকে টেকনাফে যাওয়ার রাস্তার দু'-পাশের গ্রামগুলোর খোলা আকাশের নীচে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে প্রকৃতির সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে অবস্থানরত হাজার হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু। কক্সবাজার, রামু, টেকনাফের পথে-ঘাটে অসংখ্য রোহিঙ্গা মহিলা। করো সাথে দু'টি, কারো সাথে তিনটি বাচ্চা। মহিলা ও বাচ্চাদের পরনে জীর্ণশীর্ণ কাপড়। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় ও অপুষ্টিতে তাদের চোহারা বিকৃত হয়ে গেছে। এসব মহিলারা কেউ ভিক্ষাবৃত্তি, কেউ রিফিউজি ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত সামান্য রিলিফ সামগ্রীর মাধ্যমে বছরের পর বছর জীবন কাটাচ্ছে। এদের চোখে নেই কোন স্বপ্ন, নেই ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনা। অধিকাংশ ছিন্নমূল পরিবারের সাথে কোন সক্ষম পুরুষ নেই। হয় তারা বর্মী সেনাদের বুলেটে প্রাণ দিয়েছে অথবা জেলে আটক রয়েছে। নয়ত সেনা ব্যারাকে বাধ্যতামূলক শ্রমদানে আটক আছে। অনেকে আবার মাতৃভূমি মুক্ত করার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে পরিবারের সক্ষ্যম সদস্য আল্লাহর রাহে সোপর্দ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ রোহিঙ্গা তাদের দেশ ও আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছে।

অসহায় মায়ের করুণ কাহিনী

বসনিয়ার গণহত্যা ও গণকবর জাহিলিয়াতের সকল নির্যাতনকে হার মানিয়ে সবার শীর্ষে উন্নতি হয়েছে। যে জুলুম নির্যাতনের খবর পত্র-পত্রিকায় শতভাগের একভাগও প্রকাশিত হয়নি। সার্বরা মুসলিম শিশুদেরকে মায়ের সামনেই জবাই করত। এক পত্রিকায় প্রকাশ বসনিয়ার একজন অসহায় মায়ের করুণ কাহিনী। মহিলাটির ছিল মাত্র তিনটি আদরের শিশু। হঠাৎ একদা এক নরপিশাচ মানবতার চির দুশমন সার্বীয় কয়েকজন সৈন্য এসে মহিলার ঘরে ঢুকে মহিলা এবং শিশু তিনটিকে বের করে নিয়ে এল। মহিলা এক পাশে শিশু তিনটি অপর পাশে মধ্যখানে সার্বীয় কয়েকজন কুকুরের বাচ্চা। কি করুণ দৃশ্য! শিশুগুলো চিৎকার করছে মাকে ধরার জন্য আর মা চেষ্টা করছে শিশুগুলোকে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য। কিন্তু সম্ভব হয়ে উঠছে না। অবশেষে সার্বীয় হয়েনারা মায়ের সামনে একটি শিশুকে বুলেটবিদ্ধ করে হত্যা করে। সাথে সাথে মাও অপর দুই ভাই চিৎকার করে ওঠে। তাদের চিৎকারে আকাশ-বাতাশ ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্বর সার্বীয় সৈন্যদের মনে কোন পরিবর্তন নেই। অবশেষে তারা মাকে লক্ষ্য করে বলল, যদি অপর দুই ছেলেকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে এই শিশুটির রক্ত চুষে খেতে হবে। অসহায় মা কোন উপায় না দেখে ভাবল, এক

ছেলেকে তো হারালাম, দেখি কলিজার টুকরা অপর দুই ছেলেকে কোন রকম রক্ষা করা যায় কিনা। এই ভেবে মা ছোট ছেলের রক্ত চুষে চুষে পান করল এবং অপর দুই ছেলেকে রক্ষা করল। এটা তো নগন্য একটা ঘটনা। এছাড়াও হৃদয়বিদারক হাজারো ঘটনা রয়েছে। জীবিত শিশুর অঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়। ছেলের সামনে মায়ের, ভাইয়ের সামনে বোনের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর ইজ্জত হরণ করে। যুবকদের প্রকাশ্যে জবাই করে আবার কাউকে জীবন্ত দাফন করে, জনসাধারণকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য বন্দী মুসলমানদের রশি দিয়ে গাড়ির পেছনে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে টেনে-নিয়ে যায়। এ সমস্ত অবস্থা দেখেও মানবাধিকারের দাবীদাররা সম্পূর্ণ নীরব-নিস্তব্ধ।

অন্যের অধিকারে আক্রমণ করার অপরাধে জাতিসংঘ উল্লাসের সাথে ইরাককে যে শাস্তি দিল, সার্বিয়ার ক্ষেত্রে তা কেন পারছে না। বাধাটা কোথায়? এই দু'মোখো বৈষম্য নীতির কারণ কি? ইসলাম উৎখাত করা? মুসলিম বিদ্বেষ? সত্যিই মানবাধিকারের কথা ওদের মুখে মানায় না। তথাকথিত সভ্য শ্বেত ভাল্লুকেরা কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের সাথে কুকুর-শূকরের চাইতেও জঘন্যতম দুর্ব্যবহার করে, তখন ওদের চোখে মানবাধিকার লংঘিত হয় না। আফ্রিকার কালো বর্ণের আদর্শবাদী লোকদের পাখির মত গুলি করে হত্যা করলে তাতে মানবাধিকার লংঘিত হয়না। বসনিয়ার লাখ লাখ মুসলিম মহিলাদের উপরে গণবলৎকার চালালে, গর্ভবতী মহিলাদের ভ্রূণ কুচি কুচি করে ফুটবল খেললে হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলিম নারীদের বন্দিখানায় আটকে রেখে সার্ব সেনাদের গর্বধারণ করতে বাধ্য করলে, মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালালে, শিশুদের আছড়ে মারলে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিলে মানবাধিকার লংঘন হয়না। ফিলিস্তিনিদের চৌদ্দ পুরুষদের বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত করলে কিংবা কাশ্মীরে গণহত্যা চালালে ওদের চোখে মানবাধিকার লংঘিত হয়না। অপর পক্ষে নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মুসলমানগণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ নিলে, ট্যাংকের মোকাবেলায় শুধু পাথর ছুঁড়লে তা হয়ে যায় ওদের চোখে সন্ত্রাসী তৎপরতা, মানবাধিকার লংঘন!

বিশ্বের এহেন পরিস্থিতিতে জালেমের কাছে মজলুমের মুক্তির দাবী করলে তা হবে অবান্তর। যে মানবধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ, দুনিয়াতে মজলুমের সংখ্য বৃদ্ধি করছে, তাদের কাছে মজলুমের মুক্তি আশা করা যায় না। তাই মজলুমদের মুক্তির ব্যবস্থা তাদেরই করতে হবে। প্রায়োজনে তার জন্য মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করতে হবে। সশস্ত্র জিহাদে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

ওলামায়ে কেরামের কনফারেন্স

১৮৫৬ সালে দিল্লীতে সমগ্র ভারতবর্ষের বড় বড় ওলামায়ে কেরামের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যোগদান করেন মাওলানা জাফর আলী থানেশ্বরী, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হাফেজ যামেন শহীদ (রাহঃ) প্রমুখ দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরামগণ। কন্ফারেন্সের বিষয় ছিল, 'ইংরেজদের হাত থেকে ভারতকে হেফাযত করা।'

উক্ত কন্ফারেন্সে মাওলানা কাসেম নানুতবী (রাহঃ) বলেন, 'এটা আপনাদের অজানা নয় যে, ইংরেজ আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারা সমগ্র ভারতবর্ষের উপর তাদের হুকুমতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে। এবার আমাদের সবাইকে এখান থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে হয়তো আমরা মৃত্যুবরণ করবো; না হয় লড়াই করে ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করবো। আল্লামা নানুতবী (রাহঃ)-এর বক্তব্য শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হযরত ! আমাদের সংখ্যা তো একেবারে নগণ্য। আসবাব ও রসদ নেই বললেই চলে। তখন তিনি এক ঐতিহাসিক কথা বললেন, 'আমরা কি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও কম ? মাওলানা কাশেম নানুতবী (রাহঃ)-এর এ কথা বলার সাথে সাথে গোটা মজলিসে নবচেতনা সঞ্চার হল। পুরো কন্ফারেন্স প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মরণপণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করল।

ওলামায়ে কেরামদের সিদ্ধান্ত শুধু মুখে মুখে ছিল না, মাত্র এক বছরে মাওলানা কাসেম নানুতবী (রাহঃ) ও মাওলানা জাফর আহমদ থানেশ্বীর (রাহঃ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের নজিরবিহীন প্রচেষ্টায় দু'টি গ্রুপ তৈরী হল। এক গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা জাফর আহমদ থানেশ্বরী (রাহঃ) আর অপর গ্রুপের নেতা ছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহঃ)। তাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হল ইংরেজ বিরোধী এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ।

আকাবিরে দেওবন্দ বিশাল ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্য হতে যোগ্য ব্যক্তি কে আমীর নির্বাচন করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জিহাদের আমীর বা সেনাপতি হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ শরীফের ইমাম, মসজিদে নববীর খতীব বা দেওবন্দের শাইখুল হাদীস হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং নিজেদের মধ্যে যে ব্যক্তি

যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তাকেই আমীর নির্বাচন করে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। রণকৌশলে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেনাপতি হতে পারেনা। কারণ, আবু হুরাইরা (রাঃ) হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

الحرب خدعة

অর্থাৎ ঃ যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র।

তাই তো ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কুরআন, হাদীস, ফেকাহসহ সকল বিষয়ের সাথে যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শী হতেন। হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রাহঃ) (যাঁর একটি বই পড়ে কয়েক লক্ষ খ্রীষ্টান মুসলমান হয়েছে।) প্রচন্ড শীতের মাঝে যমুনা নদীতে দৈনিক কয়েক কিলোমিটার সাঁতার কাটতেন। প্রখর রোদ্রে মরুভূমিতে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করতেন।

হ্যাঁ যদি যুদ্ধ কৌশলে অভিজ্ঞ কোন লোক না পাওয়া যায়, তাহলে একজন ফাসিকের নেতৃত্বে হলেও যুদ্ধ করতে হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا اَوْ فَاجِرًا

অর্থ ঃ একজন নেতার নেতৃত্বে তোমাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব। চাই সেই নেতা সৎ হোক কিংবা ফাসেক।

কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্য জিহাদ করব

পৃথিবীর নিয়ম হল, গোলাম তার (ক্ষণস্থায়ী) মনীবের পূর্ণ আনুগত্য করতে হয়। সামান্য অর্থের চাকর তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে, মালিকের হুকুম অমান্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। এমনকি মারধরও করে, চাকরী থেকে বহিষ্কারও করা হয়। ঠিক তদ্রূপ স্রষ্টার বিধান হল, যাদের জন্য বিশাল আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, আলো-বাতাস, সমুদ্রের মাছ ও গর্তের পিপীলিকাসহ সবই নিবেদিত। যারা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত (যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি) বিবেকের অধিকারী, যাদের দিক-নির্দেশনার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূলের প্রেরণ, তারা যদি অবাধ্য হয়, অহংকার ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে

ইহ ও পারলৌকিক কঠোর, মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক শাস্তি। পরকালের শাস্তি তো আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দিবেন । কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি ? পূর্বেকার নবীগণের উম্মতদেরকে অন্যায়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে শাস্তি দিতেন। যেমন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে মহা প্লাবনের মাধ্যমে, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে ভূমিসহ উল্টিয়ে দিয়ে, সামূদ সম্প্রদায়কে প্রলয়ংকারী বিপর্যয় দ্বারা এবং আ'দ সম্প্রদায়কে সাতদিন সাত রাত প্রচন্ড ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ বায়ু দ্বারা নিঃশেষ করে দিয়েছেন। এছাড়াও যুগে যুগে এমন হাজারো ঘটনা এ পৃথিবীতে ঘটেছে। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ্ (সাঃ)-এর বরকত ও দোয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে এভাবে শাস্তি দিবেন না । কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ন হয়, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের দ্বারা শাস্তি দিবেন এবং লাঞ্ছিত করবেন । আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ

তোমরা তাদের (কাফের) কে হত্যা কর । তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জয়ী করবেন । -তাওবা ঃ ১৪

এ হত্যার দ্বারা কাফেরদের দুনিয়াবী আজাবের সাথে সাথে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর বহু ফায়দাও রয়েছে। দুনিয়ার ফায়দা হল, দুনিয়া কুফরীর ফেৎনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত হবে। ফেরেশতা ও সৃষ্টিকূলের অভিসম্পাত থেকে মুক্তি পাবে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

আল্লাহ তা'আলা যদি একজনকে অপর জনের (কাফেরকে মুসলমানের) দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া ফেতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেত । -বাকারা ঃ ২৫১

এ কারণে জমিনে নেককার ফেরেশতাদের আগমন না হয়ে গজবের ফেরেশতাদের আগমন হয় । তাঁরা জমিনবাসীর উপর লা'নত করতে থাকে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্যের কারণে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ নানা গজব দেখা দেয়। এতে সমস্ত মাখলুকের কষ্ট হয় । জমিনের উপর মাখলুকের বদ দোয়া পড়ে । আর দুনিয়াবাসী মু'মিনদের ফায়দা হল, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

এবং মু'মিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন । তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । -তাওবাহ ঃ ১৫

কোন সচেতন যুবকের সামনে আপনজনকে হত্যা করলে যুবকের ঘুম হারাম হয়ে যায়। কিন্তু যখন ঐ অপরাধীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হয়, তখন তার অন্তর শান্ত হয়, পুঞ্জিভূত ক্ষোভ দূর হয়। ঠিক তদ্রূপ হাজারো মুসলমান যুবক- যুবতী, বৃদ্ধা, নারী-পুরুষের উপর আজ নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালাচ্ছে অভিশপ্ত ইহুদী-খ্রীষ্টানরা । তাই তাদেরকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তর শান্ত হবেনা । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

যারা রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গী, তাঁরা কাফেরের প্রতি কঠোর আর পরস্পরে সহনশীল। ফাতহ ঃ ২৯

এখানে পারস্পরিক সহনশীলতা আলোচনার পূর্বে কাফেরদের সাথে কঠোর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হলে পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হয়। নিজেদের মাঝে কোন ছোট-খাট মতানৈক্য থাকলে তাও ভুলে যায় । যেমন দু'ভাই পিতার মৃত্যুর পর সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করছে। কোন মুরুব্বী তার সমাধান করতে পারছে না। এমতাবস্থায় সুযোগ বুঝে যদি কোন জালিম তাদের ভূমি দখলের পাঁয়তারা করে এবং সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে, তখন উক্ত দু'ভাই নিজেদের বিভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পিতৃসম্পদ রক্ষা করে। ঠিক তেমনি মুসলমানরা যখন কাফেরের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হয়, তখন নিজেদের ছোট-খাট সকল মতভেদ ভুলে গিয়ে সবাই হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়।

মসজিদ-মাদ্রাসা সংরক্ষণের জন্য জিহাদ করব

স্রষ্টার বিধান সৃষ্টির জন্য শিরোধার্য। স্রষ্টাই ভাল জানেন তার সৃষ্টির জন্য কোন্‌টি কল্যাণকর আর কোন্‌টি অকল্যাণকর। যেমন প্লেন আবিস্কারক জানেন, তার প্লেনের কোথায় কি পরিমাণ জ্বালানি রাখতে হবে, কোন্ নিয়মে চালালে প্লেনের

টেকসই দীর্ঘ হবে। যদি তা আবিস্কারক বা ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী চলে, তাহলে তা শত শত যাত্রী নিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরত্বের গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবে। ঠিক এর চেয়েও লক্ষগুণ বেশী নৈপূণ্যের সাথে এই বিশাল আসমান-জমিনের স্রষ্টা সম্যক অবগত যে, কোন্ পদ্ধতি পালন করলে তার সৃষ্ট মসজিদ, মাদ্রাসা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে । মহান স্রষ্টা শুধু জেনেই ক্ষান্ত নন। তিনি দেড় হাজার বছর পূর্বে উম্মতকে জানিয়েও দিয়েছেন সে পদ্ধতি । তিনি ইরশাদ করেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا

আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং (মুসলমানদের) মসজিদ সবই ধ্বংস হয়ে যেত । যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণ স্মরণ করা হয় । -হজ্ব ঃ ৪০।

এ আয়াতের তাফ্সীরে মুফ্তী শফী সাহেব (রাহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গাম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় কোন মাযহাব ও ধর্মেরই অস্তিত্ব থাকতনা। সব ধর্ম ও উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে যেত । কথাটা অনেকটা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ । তাই এটি বুঝার জন্য একটি ঘটনার অবতারণা করছি ।

বোখারা-সমরকন্দের হৃদয়বিদারক ঘটনা

বোখারা-সমরকন্দ বর্তমান মুসলমানদের জ্ঞানের সুতিকাগার। হাদীসের সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বোখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ, ফেকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নাওয়াদের ও হিদায়া, তাসাউফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাম্বীহুল গাফেলীন এবং মানতেক ও ফালসাফার বিখ্যাত গ্রন্থের লেখকগণ এই ভূমিরই কৃতী সন্তান । তাসাউফের সমস্ত ধরাবাহিকতা এ এলাকা থেকেই প্রসারিত হয়েছে । খাজা বাহাউদ্দীন নক্শেবন্দী এখানেরই সন্তান। বোখারা সমরকন্দের মাদ্রাসাগুলো ছিল দ্বীনী ইলমের এক বিরাট দুর্গ । সেখানে ছাত্র সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, এককে মাদ্রাসায় শুধু শিশুই ছিল ত্রিশ হাজারের মত । ওলামায়ে কেরামের এমন অবস্থা

ছিল যে, সর্বত্র ছিল তাদের খানকা আর খানকা। এক কথায় বলতে হয় যে, সেটি ছিল দ্বীনের উৎসস্থল । দ্বীনের কোন দিকেরই সেখানে ক্রটি ছিলনা । হ্যাঁ, ক্রটি ছিল এক জায়গাতেই। সেটি হল জিহাদ । জিহাদের প্রেরণা তাদের মনোজগৎ থেকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ এ এলাকাটি এক সময় সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের মাধ্যমে বিজয় করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, জিহাদের প্রেরণা ও চর্চা না থাকায় এ ভূমিই পরবর্তীতে কমিউনিষ্টরা দখল করে নেয় এবং দু'হাজার মসজিদকে সমূলে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কোন কোন মসজিদকে ক্লাব, মদের আখড়া এবং ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে। কিন্তু প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা ছিলনা কারো। তখন কিছুসংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ লোক ওলামায়ে কেরামদের কাছে গিয়ে তাদেরকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে বললেন, কাফের আপনাদের দরজার সামনে। এখনও সময় আছে অস্ত্র হাতে নিন। প্রতিরোধ করুন। তারা বললেন, নেক আমল কর। নেক আমলেই কাফেরদেরকে দূর করে দিবে। এক বুযুর্গের কাছে গিয়ে বলা হল, হযরত! এখন তো খাজা বাহাউদ্দীন (রাহঃ)-এর এলাকা কমিউনিষ্টরা আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। এবার আসুন, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুর মোকাবেলায় কিছু করুন। বুযুর্গ বললেন, বাবা! অধিক পরিমাণে আল্লাহ আল্লাহ কর। ইন্‌শাআল্লাহ ঐ সব রুশ নিজে নিজেই চলে যাবে এভাবে সময় গড়াতে লাগল । কিন্তু কেউ জিহাদের জন্য এগিয়ে এলনা । পরে একদিন হঠাৎ রুশ পক্ষ থেকে ঘোষণা এল, সমস্ত লোক বোখারার সবচেয়ে বড় ময়দানে জমা হয়ে যাও । সবাই একত্রিত হল । তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, আজ আমরা বোখারা থেকে তোমাদের খোদাকে বের করে দিচ্ছি, (নাউজুবিল্লাহ) এখন তোমাদের খোদার জানাজা পড়া হবে । তোমরা সবাই এই জানাযায় শরীক হবে । এ ঘোষণা মতেই একটি মুরদার কফিন আনা হল । তাতে কাঠের তৈরী একটি প্রতিমা রাখা ছিল । এরপর তারা কফিনটি নিয়ে শহর থেকে বহু দূর নিক্ষেপ করে আসল এবং বলতে লাগল, মুসলমানদের খোদাকে বোখারার মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করেছি। নাউজু বিল্লাহ !

সুধী, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা আপাতত বাদই দিলাম। বাংলাদেশের কথাই বলছি । এ দেশে ইতিপূর্বে মসজিদে মিষ্টির প্যাকেটে বোমা পরিবেশন (ঢাকার মিরপুরে) মসজিদের ইমামকে হত্যা (ঢাকার আগার গাঁওয়ে), মসজিদ থেকে জুমার নামাযের সময় মুসল্লিদেরকে পিটিয়ে বের করে দেয়া (ফরিদপুরের নগর কান্দায়), বুলডোজারের আঘাতে মসজিদের দেয়াল ধসে দেয় (ঢাকার সেগুন বাগিচায়), পীর হত্যা (ঢাকার মিরপুরে) এবং শতাধিক মাদ্রাসায় তল্লাশির নামে

ছাত্র-শিক্ষকদের উপর অকথ্য, অবর্ণনীয় ও অমানবিক নির্যাতন, নিপীড়ন শুরু হয়েছে । এখন অবশিষ্ট আছে ঢাকার বাহাদুরশাহ পার্কে যেমন আলেমদের কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল, তেমনি এখন ফাঁসির কাষ্টে ঝুলানো ।
তাই এখনও যদি আমরা কুরআন-হাদীসের প্রতিফলন ঘটিয়ে, আকাবিরদের পদাংক অনুসরণ করে এবং জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ না হই, তাহলে সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন স্পেনের মত এদেশ থেকেও ইসলামের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে যাবে । কিন্তু মুসলমানরা শুধু নীরব দর্শকের মত তাকিয়ে থাকবে। কোন কিছু বলার মতো সুযোগ-সাহস থাকবেনা । তাই এখনও সময় আছে। ফিরে আসুন। দলমত নির্বিশেষে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ুন । মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে রক্ষায় ব্রতী হোন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন ।

শাহাদাত লাভের জন্য জিহাদ করব

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবন বিধান) হিসাবে পছন্দ করলাম। -মায়েদা ঃ ৩
এই ঘোষণার পূর্বে ইসলাম নামক বৃক্ষটিকে পূর্ণতার রূপ দিতে এবং তার পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ণতা ও সজিবতা রক্ষার্থে নজীরহীন ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করে বাতিলের শত প্রলোভন, শয়তানিয়্যাতের শত নিপীড়ন ও দাজ্জালিয়াতের শত চাতুরীর সামনে শির উচিয়ে আপন বক্ষের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাতকে সপে দিয়েছেন একদল মর্দে মুজাহিদ তারা জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন সিদ্দীকীন, শোহাদা ও সালেহীনের সম্মিলিত ও সুরক্ষিত এক জামাআত। যারা দ্বীন রক্ষায় আপন বক্ষ পেতে বুনিয়ানুম মারসুসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রণক্ষেত্রে। শয়তানিয়াত ও বাতেল শক্তির অন্ধ উন্মত্ততার লৌহচিরুনী গা থেকে খুবলে খুবলে তুলে ফেলা হয়েছে গোশ্‌ত, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে শিরা-উপশিরা, নিক্ষেপ করেছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে, ভূমিতে জীবন্ত প্রোথিত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে মস্তক, গুড়ো করে দিয়েছে সকল হাড্ডিগুলো। কিন্তু সত্য উদ্ভাসনের ও দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও তাদের বিচ্যুত করতে পারেনি ধৈর্যের সুমহান পথ থেকে। শুহাদার এই সৌধটিতে বিচরণ করেছেন অসংখ নারী-পূরুষ।

পূরুষদের মাঝে সর্বাগ্রে যায়েদ বিন আবি হালা (রাঃ) ও নারীদের মাঝে হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। এই মহান পথ ধরে জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে নিয়েছেন বদরে চৌদ্দজন, উহুদে সত্তুরজন, খন্দকে তেরজন, খাইবারে উনিশ জন, বীরে মাউনায় আটষট্টি জন, বনু লাহয়ানে দশ জন, তাবুকে ছয় জন ও অন্যান্য যুদ্ধে সত্তুরজন জানবাজ, দ্বীনের জন্য জীবন বিসর্জন করেন। খোলাফায়ে রাশেদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগে দুই হাজার পাঁচশ, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর যুগে চৌদ্দ হাজার, হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর যুগে ষোল হাজার, হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগে চার হাজার পাঁচশ, সর্বমোট সাইত্রিশ হাজার সাহাবী আপন জীবন কুরবানীর মাধ্যমে যে পথের শিক্ষা দিয়েছেন, আজ মুসলিম সমাজে ইসলামকে লাঞ্চনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপের পরও তাঁর ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জন দিয়ে ঐ মহান কাফেলার অংশীদার হতে ন্যূনতম প্রেরণা পাচ্ছেনা। বরং পাচ্ছে শুধু হিমালয়সম বাঁধার প্রাচীর; যার সামনে দাড়িয়ে কাতরাচ্ছে বহু সুঠামদেহের অধিকারী মানুষ। জাতির এহেন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলামের মহিমা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে বাঁধার প্রাচীর শির আঘাতে চূর্ণ করে শাহাদাতের পথে চলার হিম্মত যোগাতে শাহাদাতের ফযিলতের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি।

'শহীদ' নামকরণের কারণ

উপমহাদেশের ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সুযোগ্য উস্তাদ হযরত মাওলানা জামীল আহমদ ইসলামী আইন বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়ার' ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশরাফুল হিদায়া'য় এর তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

এক. ফেরেশতাগণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে আল্লাহর দরবারে শহীদদের আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন ।

দুই. শহীদগণ مشهود له بالجنه অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

তিন. শহীদগণ চিরঞ্জীব আল্লাহর দরবারে উপস্থিত।

মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব শহীদ নামের তিনটি কারণ উল্লেখ করলেও সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে শহীদ নামের আরো বহু কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে-

আল্লামা জাওহারী, কুরতুবী, ও ইবনে ফারিস (রঃ)বলেন- শহীদ এই জন্য বলা হয় যে, শহীদের রুহ দেহ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতে উপস্থিত হয়ে

যাবে , অথচ অন্যসব মুসলমান কিয়ামতের পর হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাবে। আবার কেউ বলেন, শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয়, যেহেতু শহীদ কিয়ামতের দিন আপন আঘাত নিয়ে ও রক্তাক্ত অবস্থায় হাশরের মাঠে আসবেন, সে রক্ত ও আঘাত তার জন্য সাক্ষী হবে। কেউ বলেন, শহীদ নিজেই নিজের জন্য সাক্ষী হবেন।

শহীদকে মৃত বলা নিষেধ

পৃথিবীর উষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কালের চক্রে বহু উত্থান -পতন হয়েছে। এধরা পৃষ্ঠে ফিরআউন, নমরুদ,হামান ও শাদ্দাদের মতো বহু দাম্ভিক খোদাদ্রোহী খোদা দাবিদারের তন ঘটেছে। তাদের রাজত্ব ও বেহেশত তাদেরকে রক্ষা করতে পরেনি নিষ্ঠুর মৃত্যু ও ধংসের হাত থেকে। কারণ, মহান স্রষ্টা ঘোষণা দিয়েছেন-

প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল।

দুনিয়ার কেউ মৃত্যুর ধংসাত্মক ছোবল থেকে রেহাই পাবেনা।

সুতরাং মরতেই যখন হবে, তখন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে যাতনার গ্লানি মাথায় নিয়ে কি লাভ? শাহাদাতের মৃত্যুই তো শ্রেয়। বাহ্যত এটি মৃত্যু হলেও বস্তুত এটি অনুপম এক হায়াত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ জাতীয় মৃতদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা বরং তাঁরা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না। বাকারা ঃ ১৫৪।

দ্বীনকে সু-উচ্চ করার লক্ষে মুসলমান যে লড়াই করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাধারণ যুদ্ধ, লড়াই বা সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত করেননি। জিহাদ শব্দের মাঝে আল্লাহ তাআলা একটি গোপন শক্তি রেখে দিয়েছেন। একারণে জিহাদ শব্দটি বলার দ্বারা কাফেরের অন্তরে প্রচন্ড ভয় সৃষ্টি হয়,মুসলমানদের অন্তরে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং জযবা বৃদ্ধি পায় । তদ্রূপ জিহাদের পথে নিহত ব্যক্তিকে মৃত বা নিহত বলে আখ্যায়িত করা হয়নি, তাকে শহীদ নামে ভূষিত করেছেন। এর মাঝেও রয়েছে এক অতুলনীয় ভালবাসা ও

সম্মান। আল্লাহ্ তাআলা গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে আয়াতের মাঝে শহীদকে মৃত বলতেও নিষেধ করেছেন। মুফাসসিরগণ এর সুস্পষ্ট দু'টি কারণ উল্লেখ করেন ।

এক. শহীদ বাস্তবিক পক্ষেই জীবিত, যে খাদ্যও ভক্ষন করে, পানিও পান করে।

দুই. মৃত বলার দ্বারা জীবিতদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়, কাফেরদের হামলার পথ সুগম হয়। কারণ, যদি কোন মুসলিম বাহিনীর নিকট বলা হয় যে, অমুক বাহিনীর বিরাট এক অংশ মরে গেছে বা নিহত হয়েছে, তবে এই বাহিনীর মাঝে ভয় ও হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়, পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, তারা অধিকাংশই শহীদ হয়ে গেছে, তবে বাকীদের অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

শহীদকে মৃত ধারণা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। -আলে ইমরান ঃ ৮০ আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি, তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই।

উল্লেখিত আয়াতে শহীদদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) তাঁরা অনন্ত জীবন লাভ করেন।

(২) আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের রিযিক প্রদান করা হয়।

(৩) তাঁরা সদা-সর্বদা আনন্দ মুখর থাকবেন।

(৪) তাঁরা যেসব উত্তরসূরীকে পৃথিবীতে রেখে গেছেন, তাদের ব্যাপারেও আনন্দ অনুভব করবেন, যদি তারা দুনিয়াতে জিহাদে নিয়োজিত থাকে।

আল্লামা সাদী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শহীদের আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাকে পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আগমন করছে। তখন শহীদ এরূপ আনন্দিত হন, যেরূপ পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময় পর সাক্ষাত হলে হতেন। আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে র্বণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন যে, উহুদের ঘটনায় যখন

তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হল, তখন আল্লাহ তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের ভিতর স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহ্রণ করেন এবং তারপর সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর আরশের নীচে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করেন, তখন বলেন, আমাদের আত্নীয়-স্বজনরা পৃথিবীতে আমাদের শাহাদাতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

বিশেষ মর্যাদায় শহীদ

হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা শহীদগণকে ছয়টি বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন-

১) শহীদের রক্তের ফোঁটা যমিনে পতিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

২) মৃত্যুর পূর্বেই শহীদকে জান্নাতে অবস্থিত তাঁর ঠিকানা দেখানো হবে।

৩) কবরের আজাব ও সিংঙ্গা'য় ফুৎকারের পর ভয়াবহ অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজতে রাখবেন।

৪) শহীদের মাথায় এক মহান ইজ্জতের তাজ পরানো হবে যার একেকটি মুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু রয়েছে, তদপেক্ষা উত্তম।

৫) শহীদকে সত্তরজন হূরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৬) শহীদ নিজের আপনজনদের মধ্য হতে সত্তরজনের জন্য জান্নাতের সুপারিশ করতে পারবেন। (তিরমিযী)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! সমস্ত মুসলমানের কবরে পরীক্ষা নেয়া হবে; কিন্তু শহীদের কেন পরীক্ষা নেয়া হবে না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, শহীদের মাথার উপর কাফিরের তলোয়ারই পরীক্ষার জন্য যথেষ্ঠ। কবর ও হাশরের কঠিন পরীক্ষা সে জিহাদের ময়দানেই দিয়ে ফেলেছে। (দাওয়াতে জিহাদ)

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) তাফসীরে কুরতুবীর চতুর্থ খন্ডে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এক আশ্চর্যকর বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, শহীদকে পাঁচটি এমন বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে, যা নবীদেরকেও দেয়া হয়নি।

১) সমস্ত নবীদের রূহ হযরত আজরাঈল (আঃ) কবজ করেছেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহকেও আজরাঈল (আঃ)

নিয়ে যাবেন। কিন্তু; শহীদগণের জান আল্লাহ ত'আলা খাছ কুদরতি হাতে কোন ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত কবজ করবেন।

২) সমস্ত নবীদের মৃত্যুর পর গোসল দেয়া হয়। আমাকেও (রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) গোসল দেয়া হবে। কিন্তু শহীদগণকে শাহাদাতের পর গোসল দেয়া হবে না।

৩) সমস্ত নবীদেরকে মৃত্যুর পর কাফন পরানো হবে। এমনকি আমাকেও (রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) কাফন পরানো হবে। কিন্তু শহীদগণকে শাহাদাতের পর কাফন পরানো হবে না।

৪) সমস্ত নবীকে মৃত্যুর পর মৃত নামে অভিহিত করা যায়; কিন্তু শহীদকে মৃত বলে অভিহিত করা যায় না।

৫) সমস্ত নবী কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন। আমিও (রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করব। কিন্তু শহীদ সর্ব সময়, সর্বাবস্থায় সুপারিশ করতে পারবে।

নবী হয়েও শাহাদাতের আকাঙ্খা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার জান, যদি এমন মুসলমান না থাকত, যাদের পক্ষে আমি যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর ঘরে বসে থাকা সহনযোগ্য নয়, এদিকে আমারও এতটুকু সামর্থ নেই যে, তাদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তবে আমি আল্লাহর রাহে জিহাদরত কোন সৈন্য দলের সাথে যুদ্ধে শরীক না হয়ে পিছনে থাকতাম না।

সে সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করতে করতে শহীদ হব, আবার জীবিত হব এবং শহীদ হব, আবার জীবিত হব এবং শহীদ হব। (বুখারী,মুসলিম)

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মুখে বার বার শাহাদাতের তামান্না অবশ্যই শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদার প্রমান বহন করে। উম্মতের কান্ডারী নবী নিজের সকল প্রিয়তম আমলের উপরে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রত্যাশাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ আজ আমাদের কোন কোন বন্ধু বলে থাকেন, "জনাব! আমরা যদি জিহাদে চলে যাই, তবে আমাদের অবর্তমানে দ্বীনের বাকী কাজ কে করবে? এখন আমাদের ঘরে থাকাই বেশী দরকার।"

কি চমৎকার বিবেচনা! দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করার মধ্যে এ বিবেচনাটা কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবেচনার মত হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন অপেক্ষা তাদের জীবন কি বেশি মূল্যবান? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তো প্রতিটি

অভিযানে এবং প্রতিটি রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে থাকতে আগ্রহী যে চিন্তা ও অজুহাত আমরা প্রদর্শন করছি, সেগুলো উল্লেখিত হাদীসের আলোকে যাচাই করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। একথাও উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তি কোন অনিবার্য কারণে জিহাদে শরীক হতে অক্ষম, সে নিজেকে ক্ষমার্হদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে এবং সর্বদা এরাদা রাখবে যে, ওজর শেষ হলেই জেহাদে অংশ নেব। (চল্লিশ হাদীস)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, অর্ধ জাহানের খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাঃ) কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আল্লাহর দরবারে শাহাদাত প্রার্থনা করতেন। তিনি সর্বদা ফরিয়াদ করতেন-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে তোমার পথে শাহাদাত নসীব কর এবং তোমার রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র ভূমিতে মৃত্যু দান কর।

শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপের কাফ্ফারা। (বুখারী,মুসলিম)

হযরত আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিহাদের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর উপর ঈমান আনা উভয় আমল সমস্ত আমল অপেক্ষা উত্তম। এতদশ্রবণে উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক জন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! যদি আমি আল্লাহর পথে মারা যাই, তবে আমার সমস্ত গুনাহ মাফ্ হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ! সাওয়াবের নিয়তে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হওয়া অবস্থায় মারা গেলে সমস্ত গুনাহ্ মাফ্ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকটিকে পুণরায় তার প্রশ্ন করতে বললেন। লোকটি দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সাওয়াবের নিয়তে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হওয়া অবস্থায় মারা গেলে সমস্ত গুনাহ মাফ্ হয়ে যাবে। কিন্তু ঋণ মাফ হবে না। এই সংবাদ জিব্রাঈল এই মাত্র আমাকে দিয়ে গেলেন।

আল্লামা ইবনে রশীদ (রহঃ) আপন গ্রন্থ মুকাদ্দামায়ে ইবনে রশীদে বর্ণনা করেন, ঋণের প্রশ্ন কেবল ইসলামের শুরু যোগেই ছিল। পরবর্তিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে শহীদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। আল্লামা কুরতুবী (রাহঃ)

তফ্সীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করেন যে, ঋণ জান্নাতে প্রবেশের জন্য প্রতিবন্ধক তখনই হয়, যখন ঋণ আদায়ের সামর্থ থাকা অবস্থায় মারা যায়; কিন্তু ওসিয়ত করেনি অথবা ঋণ আদায়ের সামর্থ ছিল, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে তা আদায় করেনি। অথবা ঋণগ্রহীতা টাকা দ্বারা অপ্রয়োজনীয়- বেহুদা কাজে ব্যয় করে তারও অবস্থা তাই। আর যে ব্যক্তি অতি প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে, তার ক্ষেত্রে এ অবস্থার সৃষ্টি হবে না।

শহীদের মৃত্যুতে কষ্ট হয় না

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- শহীদগণের মৃত্যুর কষ্ট সামান্য পিপিলিকার কামড়ের চেয়েও কম অনুভূত হয়। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- সাধারণ মৃত্যুর কষ্ট দশ লক্ষ তলোয়ারের আঘাত অথবা বড় বড় পাহাড় মাথার উপর ধসে পড়ার মত কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে শহীদ বা মজলুমের মৃত্যুতে একটি পিপিলিকার দংশনসম কষ্টও অনুভব হয় না।

বর্ণিত আছে, কবরবাসীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ ফেরেশতা প্রত্যহ রাতে ঘোষণা করতে থাকে, হে কবরবাসী! তোমরা কাদের উপর ঈর্ষা করে থাক? উত্তরে কবরবাসী বলে, আমরা শহীদের উপর ঈর্ষা করে থাকি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, শহীদ প্রত্যহ দুইবার তার প্রভূর দিদার লাভ করে। শহীদ দুনিয়া ত্যাগের ফলে কোন প্রকার আক্ষেপ করে না। (ইবনে আসাকির)

শহীদের উপর ফেরেশতাদের ছায়া

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার শহীদ পিতাকে নবী কারীম (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত করা হল। আমি সেখানে তাঁর চেহারা দেখার জন্য উপস্থিত হলাম। কিন্তু কিছু লোক আমাকে পিতার চেহারা দেখা থেকে বাধা প্রদান করল। কারণ, তাঁর চেহারা একেবারেই বিকৃত করা হয়েছিল ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই একজন মহিলা চিৎকার করে আসতে লাগল, যে ছিল শহীদের বোন বা মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? তাঁর (শহীদ ব্যক্তির) উপর তো ফেরেশতারা আপন ডানা দিয়ে অনবরত ছায়া দিচ্ছে। (বুখারী শরীফ)

দুনিয়ায় প্রত্যাগমনের আকাঙ্খা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর কোন ব্যক্তিই দুনিয়ায় প্রত্যাগমনে রাজী হবেনা যদিও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিক তাকে এর বিনিময়ে দেয়া হোক। কিন্তু একমাত্র শহীদ পুনরায়

দুনিয়াতে এসে জিহাদের মাধ্যমে দশবার শাহাদাত অর্জনের আকাঙ্খা করবে। শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা ও বর্ণনাতীত নিয়ামতই শহীদের অন্তরে এই প্রেরণা যোগাবে। (বুখারী -মুসলিম)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কিয়ামত দিবসে একজন জান্নাতীকে আল্লাহ তা'আলা দরবারে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, হে আদম সন্তান! তুমি জান্নাতে মর্যাদা ও নিয়ামত কেমন পেয়েছ? প্রতি উত্তরে সে বলবে, অত্যন্ত উত্তম মর্যাদা ও নিয়ামত পেয়েছি। আল্লাহ তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কোন আকাঙ্খা আছে কি? উত্তরে সে বলবে, আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। কারণ, আমি সমস্ত জিনিষই পেয়েছি। তবে একটি প্রত্যাশার বস্তু রয়েছে, তাহল আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, যাতে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটি আপনার পথে আরো দশবার বিলিয়ে দিতে পারি এবং সর্বোৎকৃষ্ট শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। (দাওয়াতে জিহাদ)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, জান্নাতে প্রবেশের পর এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যাবেনা, যাকে দুনিয়া ও তার মাঝে অবস্থিত সমস্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে দিলেও তোমাদের দিকে (দুনিয়ায়) প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করবে। কিন্তু শহীদ (বার বার দুনিয়ায় এসে শাহাদাত লাভের আকাঙ্খা করবে।)

হযরত ইবনে আবী উমাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে যাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট শাহাদাত লাভ করা অধিক প্রিয়। (দাওয়াতে জিহাদ)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জাবের! তুমি পেরেশান কেন? উত্তরে আমি বললাম, আমার পিতা বহু ঋণ ও কন্যা সন্তান রেখে শাহাদাত লাভ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে জাবের! আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাব না? আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতার সাথে পর্দাহীনভাবে মুখোমুখী হয়ে কথোপকথন করছেন। আল্লাহ তোমার পিতাকে বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি আজ যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আমি তা পূর্ণ করব। উত্তরে আব্দুল্লাহ বললেন, হে আমার প্রভূ! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান, যাতে আমি আবার শাহাদাত লাভ করতে পারি।আল্লাহ তা'আলা বললেন, এতো সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, একবার শাহাদাতের পর কাউকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো হয়না। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বললেন, হে আমার প্রভূ! যারা বর্তমানে

দুনিয়াতে অবস্থান করছে, তাদের নিকট আমার এ অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দিন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করে দিলেন। (সুনানে বাইহাক্বী) বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মাসরূক (রঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এই আয়াত সম্পর্কে আমরাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তাদের (শহীদ) রুহকে সবুজ পাখির মধ্যে রেখে দেয়া হয়, শহীদের রুহ তার সাহায্যে সমস্ত দিবস জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে অবশেষে আল্লাহর আরশের নীচে ঝুলন্ত একটি বিশেষ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের কি কোন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে? প্রতি উত্তরে তাঁরা বলেন, আমাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আমরা তো প্রত্যাশিত জান্নাত পেয়েছি, মুক্তভাবে তার মাঝে বিচরণ করছি। এরূপ তিনবার প্রশ্ন উত্তরে তাঁরা (শহীদগণ) বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস চাওয়া কামনা করেন। তাই তাঁরা বলেন, হে আমাদের প্রভূ! আমরা চাই আমাদের রূহকে আপনি পুনরায় আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা দুনিয়াতে গিয়ে আবার আপনার পথে শহীদ হতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্য কোন চাওয়া নেই দেখে পুনরায় জান্নাতে ছেড়ে দিবেন। (মুসলিম শরীফ)

শহীদগণ অবশ্যই জান্নাতী

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমি মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছি, বিনিময়ে তাদের জান্নাত অর্জিত হবে। হাদীসে নববীতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাকে তিন শ্রেণীর লোককে দেখানো হয়েছে, যারা জান্নাতে সর্বাগ্রে প্রবেশ করবে। (ক) শহীদ। (খ) আপন সতীত্ব রক্ষাকারী নারী। (গ) ঐ গোলাম, যে আল্লাহ ও মনিব উভয়ের হক্ব আদায় করে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ ত'আলা দুই ব্যক্তির কারণে হাসেন। এক হল যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে মুসলমানকে শহীদ করে। শহীদ ও শহীদকে হত্যাকারী উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এরূপ কিভাবে সম্ভব? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, মনে কর একজন

কাফের মুসলমানকে শহীদ করে তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দিল, অতঃপর ঐ কাফের ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের সুধা পান করে জান্নাতে প্রবেশ করল। (বুখারী শরীফ)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের ময়দানে শাহাদাত লাভ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো শাস্তি দিবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, (জান্নাতে) আদন্ নামক পাঁচশত দরজা বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার প্রতিটি দরজায় অতি সুন্দরী পাঁচশতজন করে হুর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই দরজা দিয়ে শুধু নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণ প্রবেশ করবেন। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা একজন নিগ্রো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি তো অত্যন্ত কাল, আমার চেহারা অত্যন্ত কুশ্রী, মুখেও কোন সুগন্ধি নেই, এমতাবস্থায় যদি আমি কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হই, তবে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন, জান্নাতে। উক্ত ব্যক্তি এ কথা শ্রবণ করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং কাফেরের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর লাশের নিকট গিয়ে বললেন তোমার আকৃতিকে সুন্দর করা হয়েছে, মুখের দুর্গন্ধকে সুগন্ধ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তোমার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, ঐ ব্যক্তির জন্য হুরদেরকে স্ত্রী বানানো হয়েছে এবং রেশমের জুব্বা পোশাক রূপে পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল হযরত যায়াল (রাঃ)।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য জিহাদ করব

দাতা যত বড়, তার দানও তত বড়ই হয়। তদ্রূপ বিচারক যত বড় তার বিচারও তত বড়, সূক্ষ্ম ও কঠোর হয়। একজন গ্রাম্য বিচারক যত কঠোর বিচারই করুক না কেন, কোন দিন কারো ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের চিন্তাও করতে পারেনা। অন্যদিকে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যদন্ডে দন্ডিত করতে পারে। যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করে রাখতে পারে। কোটি কোটি টাকা জরিমানা করতে পারে। সমস্ত বিচারকের বিচারক আহকামুল হাকিমীনের বিচার দুনিয়ার সকল বিচারকের চেয়ে কঠিন ও সুনিপুণ। তিনি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় জিহাদের

ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণে কঠোর শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু সে শাস্তি যে কেমন হবে, তা চিন্তাও করা যায় না।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ - اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হওয়ার কথা বলা হয়, তখন মাটি আকড়ে ধর? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই তুচ্ছ। যদি (জিহাদে) বের না হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পরবে না। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

-তাওবা-৩৮.৩৯

উপরোক্ত আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হল যে, তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মান্তিক কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। এভাবে কুরআনের আরো বহু আয়াতে জিহাদ পরিহারের বিভিন্ন শাস্তি কঠোর ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ শুধু শাস্তির কথা বলেই শেষ করেননি, সাথে সাথে জিহাদে বের হওয়ার জন্যও বিভিন্ন স্থানে উৎসাহিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? (জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের সে পথটি হল) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

(সূরা সফ্ফ-১০.১১)

করুণার আধার মহান আল্লাহ্ দুনিয়ার মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য জিহাদকে বাণিজ্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, সাধারণত সকলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ বুঝে এবং তার দিকে অতিশয় ধাবিত হয়। তাই আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের সকল বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম বাণিজ্য হল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নের সাথে সাথে নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

জাহান্নাম এক কঠিন শাস্তির স্থল, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তথাপি কয়েকটি হাদীস দ্বারা জাহান্নামের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দুইখানা জুতা পরানো হবে। এতেই তার মগজ এমনভাবে টগবগ করতে থাকবে, যেমনভাবে তোমাদের পাত্রে কোন বস্তু ফুটতে থাকে। অথচ সে ধারণা করবে আমা অপেক্ষা কঠোর শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবু তালিবের। তার দু'পায়ে দুখানা জুতা পরানো হবে। এতেই তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। (বুখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকে, তবে কি তুমি তার বিনিময়ে এই আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করবে? সে বলবে, 'হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন- আদমের ঔরসে থাকাকালে তার চেয়েও সহজ বিষয়ের আমি হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নামের আগুন

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। সাহাবীদের পক্ষ থেকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তাকে সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো ঊনসত্তর ভাগ বৃদ্ধি করা হবে। (বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়েছে, তাতে তার রং লাল হয়। তারপর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হয়, তাতে তার রং সাদা হয়। অতঃপর এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়, তাতে তার রং হয় কাল। এখন ঘোর অন্ধকার জমকালো অবস্থায় রয়েছে। (তিরমিযী)

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাঃ) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, জাহান্নামের আগুন তাদের পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। কারো আগুন হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছবে, কারো কোমর পর্যন্ত পৌঁছবে, আবার কারো গলা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন পৌঁছবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- আল্লাহর বাণী-

وهم فيها كالحون

এর অর্থ হল জাহান্নামের অবস্থা এই যে, আগুনের প্রচন্ড তাপে জাহান্নামীর মুখ ভাজা-পোড়া হয়ে উপরের ঠোঁট উপরের দিকে যেয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌছে যাবে এবং নীচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে। (তিরমিযী)

জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামের মাঝে খোরাসানী উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ রয়েছে, যে সাপ একবার দংশন করলে তার বিষক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মাঝে এমন সব বিচ্ছু আছে, যা পানান বাধা খচ্চরের ন্যায়, তার একটি দংশনে বিষক্রিয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভব করবে। (মুসনাদে আহমদ)

জাহান্নামীদের পানীয়

হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী سقى من ماء صديد يتجرعه (জাহান্নামের পুঁজ ও কদর্য রক্ত জাহান্নামীদের পান করতে দেয়া হবে, যা তারা ঢোকঢোক করে গলাধঃকরণ করবে।) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেওয়া হবে, কিন্তু সে তা পছন্দ করবেনা। যখন তা মুখের নিকটবর্তী করবে, তখন তার চেহারা (উত্তাপে) দগ্ধ হয়ে যাবে এবং মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন তা পান করবে, তখন তার নাড়ি-ভূঁড়ি টুকরো টুকরো হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, " এবং জাহান্নামীদের এমন তপ্ত-গরম পানি পান করানো হবে, যে পানি তার নাড়িভূঁড়ি ছিঁড়ে মলদ্বার দিয়ে বের করে ফেলবে।"
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "জাহান্নামীরা যখন পানি চাইবে, তখন তেলের গাদের ন্যায় পানি তাদের দেয়া হবে,যা তাদের চেহারা দগ্ধ করবে। তা অতি মন্দ পানীয়।" (তিরমিযী)
হযরত আবু সাঈদ খুদরী-(রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের কদর্য- পুঁজের এক বালতি (যা তাদের পান করানো হবে) যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়,তবে গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিবে। (তিরমিযী)

জান্নাত লাভের জন্য জিহাদ করব

জান্নাত লাভ করা প্রতিটি বনী আদমের ঐকান্তিক প্রত্যশা। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী,খ্রীষ্টান কেউই এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তারা জান্নাত না বললেও স্বর্গ বলে সেটাকে বুঝায়। তাদের সকলেরই পরম আশা যে, তারাই স্বর্গে যাবে। সকলেই দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবনে চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভের প্রচেষ্টা করে। হিন্দুর প্রতিমা পূঁজা ও তুলসিসহ বহু জিনিসের বন্দনার মাধ্যমে তারা স্বর্গ লাভের আশা ও চেষ্টা করে। খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মরিয়ম (আঃ) কে যথাক্রমে আল্লাহর বেটা, স্ত্রী, বোন মনে করে রবিবারে গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করে একমাত্র স্বর্গ লাভের জন্যই। এভাবে দুনিয়ার সকল জাতি স্বর্গ লাভের এক মহান আশা বুকে বেধে স্ব-স্ব রীতিনীতিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও পদ্ধতি তথা ঈমান ও আমলের ভ্রষ্টতার দরুন তাদের সকলেরই আমল হচ্ছে কুফরী,শিরকী। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

তারাই সে সব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে পন্ড হয়ে গিয়েছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। -কাহফ ঃ ১০৪

ফলে তাদের পরিণতি একমাত্র চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কারণ, তাদের নিকট তাওহীদের সঠিক দাওয়াত পৌঁছার পরও তারা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী।

অন্যদিকে মুসলমানগণ একত্ববাদে বিশ্বাসী। এই তাওহীদপন্থীদের মাঝে আবার দু'টি ভাগ রয়েছে।

এক. উম্মতে মুহাম্মদী। **দুই.** পূর্বেকার সব নবীদের উম্মত।

ইতিহাসে দেখা যায়, পূর্ব যুগের উম্মত বিজন বনে, গহীন জঙ্গলে, বা পাহাড়ের গুহায় শত বছর কাটিয়ে দিতেন, আল্লাহর ইবাদত করতেন। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবনে খুব কম সময়ই ইবাদত করে। অথচ জান্নাতে উম্মতে মুহাম্মদীই সবার্গ্রে যাবে। কারণ, নবী কারীম (সাঃ) তাঁর উম্মতকে জান্নাত লাভের এমন কিছু সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়েছেন, যার মাধ্যমে তারা কবরের অবস্থান ও হাশরের মাঠের হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা করবেনা, বরং মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু আজ সেই সংক্ষিপ্ত পথ থেকে আমরা বহু বহু দূরে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

الجهاد مختصر طريق الجنة

"জিহাদ জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, জিহাদ এমনই একটি আমল, যার ফল জান্নাত। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। আর বলা হবে, যেথায় ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও, যা ইচ্ছা ভক্ষণ কর। দুনিয়ার অন্য কোন আবেদ-বুজর্গই শহীদের ন্যায় এত দ্রুত জান্নাতে যাবে না। সবাইকে কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষ করতে হবে। হাশরের মাঠে বহু কাল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। জান্নাতে যাওয়ার প্রধান বাধা হচ্ছে হিসাব নিকাশ। যারা জিহাদ করে শহীদ হবে তারা হিসাব ব্যতীত জান্নাতে চলে যাবে। এক হাদীসে মুজাহিদদের চিরকাল জান্নাতবাসের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কাফেরকে হত্যাকারী ব্যক্তি (মুজাহিদ) আর ঐ কাফের কোন দিন জাহান্নামে একত্রিত হবে না। অর্থাৎ কাফের হবে চিরকালীন জাহান্নামী আর মুজাহিদ হবে চিরকালীন জান্নাতী। শুধু কাফের হত্যাই নয়, বরং ইসলামের শত্রু ইহুদী-খ্রীষ্টান তথা যে কোন কাফের এবং তাদের দোসরদের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলেও তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাত দিবেন।

১) তীর প্রস্তুতকারক, যে সাওয়াবের নিয়তে তা তৈরী করেছে।

২) যে তীরটি ইসলামের জন্য ব্যবহার করেছে।

৩) উভয় শ্রেণী তথা প্রস্তুতকারক ও নিক্ষেপকারীকে যে ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে সাহায্য করেছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং ঘোড়দৌড় শিক্ষা কর। তোমাদের তীর নিক্ষেপ আমার নিকট ঘোড় দৌড়ের চেয়ে অধিক প্রিয়। তীর নিক্ষেপ করা জিহাদের জন্য ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও নিজে ঘোড়া চালনা শিক্ষা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে খেলাধুলা করা এই ত্রিবিধ খেলা ছাড়া সর্ব প্রকার খেলা অনর্থক। জিহাদে শুধু তীর নিক্ষেপ আর কাফের হত্যা করলে নয় বরং শুধু কিছুক্ষণের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেও তার জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। এমর্মে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এই পরিমাণ সময়ও যদি কেউ আল্লাহর পথে জিহাদ করে, যতটুকু সময় একটি উটনীর দুধ দোহন করতে লাগে, তাহলেও তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তবে শর্ত হল, জিহাদ শুধু মাত্র আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য হতে হবে। এমন হাজারো ফাযায়েলের আয়াত-হাদীস রয়েছে, যেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, জিহাদই একমাত্র আমল আর শাহাদাতই একমাত্র মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষ সর্বাগ্রে অতি সহজে জান্নাত লাভ করবে।

জিহাদ জান্নাত লাভের শর্ত

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

আল্লাহ্ ও মুমিনদের মাঝে এই ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয়েছে এই শর্তে যে,

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

তারা (মুমিনগণ জান্নাত লাভের জন্য) আল্লাহর রাহে লড়াই করে আর এই লড়াইয়ের এক পর্যায়ে তারা কাফের মারে এবং নিজেও শহীদ হয়। -তাওবা ঃ ১১১

মুমিন যখন ফী সাবীলিল্লাহ্-এর মার্কেটে গিয়ে কাফেরদের হত্যা করবে এবং নিজে শহীদ হবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে হত্যার সাথে সাথে জাহান্নাম দিবেন আর মুমিনকে জান্নাত দিবেন। জান-মাল বিসর্জনের বাজারে গমন ব্যতীত এই সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব নয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

তোমাদের কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে আর কারা ধৈর্যশীল? - আলে ইমরান ঃ ১৪২

জিহাদ না করে এবং কষ্ট স্বীকার না করে জান্নাতে প্রবেশ করা দুষ্কর। এই আয়াতের তাফসীরে আলেমকুল শিরমণি, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক সাহেব বলেন, জিহাদ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যারা জিহাদ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বাছাই করে করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এছাড়াও হাদীসে নববীতে উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি জিহাদ করলনা বা জিহাদের স্পৃহাও অন্তরে রাখলনা, তার মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু আর মুনাফিকের মৃত্যু নিঃসন্দেহে জাহান্নামে পৌঁছার কারণ।

আলোচ্য আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে ويعلم الصبرين অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নিবেন, তোমাদের মধ্যে কারা সবরকারী। কেউ কেউ সবর-এর অপব্যাখ্যা দেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে হীনম্মন্যতা ও কাপুরুষতা আসে, যা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ধ্বংসের কারণ।

জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জান্নাতের আভিধানিক অর্থ, ঘন বৃক্ষের ছায়াদার বাগান। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলা নেককার বান্দাদের জন্য যে শান্তিময় বাসস্থান তৈরী করে রেখেছেন, তাকেই জান্নাত বা বেহেশ্‌ত বলে। উক্ত স্থানটি মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য এবং গাছ-বৃক্ষে ভরপুর, তাই তাকে জান্নাত বলে । অদৃশ্য এ বিষয়টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। জান্নাত কল্পনাতীত বিস্ময়কর স্থান, যার বর্ণনা হাদীসে কুদসীতে পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কল্পনাও করেনি।"

অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-

"এতভিন্ন তাদের জন্য চোখ জুড়ানো আনন্দদায়ক যে সমস্ত সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নেই।" (বুখারী-মুসলিম)

জান্নাতের বৃক্ষ

জান্নাতের গাছগুলো কিরূপ হবে, তাতো কল্পনাতীত। তবে হাদীসে তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হল।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বেহেশতের সকল গাছেরই কান্ড হবে স্বর্ণের। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আস্‌মা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি, যখন তাঁর সম্মুখে সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা তোলা হল, তিনি বললেন, তার শাখার ছায়ায় দ্রুতগামী সওয়ারী একশত বৎসর ভ্রমণ করতে পারবে। অথবা বলেছেন, একশত সওয়ারী তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। এই দুই বাক্যের নবী (সাঃ) কোন বাক্যটি বলেছেন, তাতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে। তা সোনার পতঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত হবে এবং তার ফল মটকার ন্যায় বৃহদাকারের হবে। (তিরমিযী শরীফ)

জান্নাতের মূল্য

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বেহেশতে একটি চাবুক রাখা পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম। (বুখারী-মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) আরো বলেন, নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যদি কোন সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বৎসর পরিভ্রমণ করে তবু তার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। বেহেশতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ জায়গা সূর্য উদয়স্থল থেকে অস্তস্থল তথা সমগ্র পৃথিবী হতে উত্তম। (বুখারী-মুসলিম)

জান্নাতী হুর

হুর সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, যার বিশদ বর্ণনা এ ক্ষুদ্র বইয়ে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

তথায় (জান্নাতে) থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি। রহমান-৫৬

فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ

সেখানে (জান্নাতে) থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। -রহমান-৭০

حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ

তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। রহমান-৭২

وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ

তথায় (জান্নাতে) থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়। ওয়াক্বিয়া-২২-২৩

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হুর) পৃথিবীর পানে উকি দেয়, তবে সমগ্র জগৎ (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে যাবে। এমনকি তাদের (হুরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া এবং তার সমস্ত সম্পদের চেয়ে অধিক উত্তম। (বুখারী)
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একজন বেহেশতী ব্যক্তি সত্তরটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। অতঃপর একজন মহিলা (হুর) এসে তার কাঁধে টোকা দিবে, তখন সে ঐ মহিলার দিকে ফিরে তাকাবে। তার (হুর) চেহার আয়না অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ হবে এবং তার গায়ে রক্ষিত মামুলী মুক্তার ঔজ্জল্য পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে উজ্জ্বল করে দিবে। মহিলাটি উক্ত পুরুষটিকে সালাম করবে। সে সালামের জওয়াব দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে,তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলবে, আমি مزيد তথা অতিরিক্ত নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। তার পরনে রং-বেরং-এর সত্তরটি কাপড় থাকবে এবং এর ভিতর দিয়েই তার পায়ের নালার মজ্জা দেখা যাবে। আর তার মাথায় এমন মুকুট হবে, যার নিম্নমানের মুক্তার আলো পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তথা সমগ্র দুনিয়া আলোকিত করে দিবে। (মুসনাদে আহমদ)

(হাদীসের মাঝে উল্লেখিত,"অতিরিক্তের অন্তর্ভুক্ত" এর অর্থ কুরআনে জান্নাতীদের নেয়ামত সম্পর্কে এক স্থানে উল্লেখ রয়েছে, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ অর্থাৎ, জান্নাতবাসীগণ ঐ সমস্ত বস্তু পাবে, যা তারা আকাঙ্খা করবে। এতদ্ভি আমার পক্ষ হতে আরো অতিরিক্ত নাজ-নিয়ামত দেয়া হবে।)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, বেহেশ্তের হুরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে বুলন্দ আওয়াজে এমন সুন্দর সুরে গান গাইবে, সৃষ্টিজীব কখনো সে সুর শুনেনি। তারা (হুরগণ) বলবে, আমরা সর্বদা সুখে থাকব, কখনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা আমাদের জন্য যিনি। (তিরমিযী)

জান্নাত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সবর সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মদকে মধু, আর শূকরের গোশতকে খাসীর গোশত বলে বিক্রির ন্যায় ইয়াহুদী,খ্রীষ্টান ও তাদের পদলেহী এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান কাপুরুষতাকে সবর বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ফলে মুসলমানদের মনোঃজগতে সবর আর কাপুরুষতা নিয়ে এক প্রকার সংশয় সৃষ্টি

হয়েছে। আর এই সুবাধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শত্রুরা মুসলমানদের উপর হিংস্র থাবা বিস্তার করছে। আরো উদ্বেগের বিষয় হল, ইতিমধ্যে তারা এপথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। মুসলমানদের মুখেই তারা তাদের মতবাদ প্রচার করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে সমূহ অত্যাচার-নির্যাতন, নিপীড়ন, অস্ত্র সন্ত্রাস ও তথ্য সন্ত্রাসের সামনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি সচেতন মুসলিম সমাজ। তাই সময়ের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জিহাদী জযবা পুনরায় শাণিত করতে নিম্নোক্ত বিষয়টির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি নিবন্ধ করছি।

সবরের সংজ্ঞা

সবরের সংজ্ঞা নির্দেশে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রঃ) মুফরাদাত নামক গ্রন্থে লেখেন, সবর অর্থ বিবেক বা শরীয়ত যে অবস্থার উপর বিদ্যমান থাকা দাবী করে, সে অবস্থার উপর নিজের নফস্‌কে আবদ্ধ রাখা এবং ঐ অবস্থা থেকে নফসকে দূরে রাখা, যা আকল ও শরীয়ত দাবী করে। আল্লামা ইস্পাহানীর (রহঃ) দেয়া সংজ্ঞার মূলকথা, সর্ব প্রকার ইবাদতের উপর অবিচল থাকা এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকার নাম সবর।

ইমাম যান্নুন (রহঃ) সবরের ব্যাখ্যায় বলেন, সবর অর্থ অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা, বিপদের মুখে সংযত থাকা এবং অনটনের মুখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। উভয় প্রকার সংজ্ঞার সারকথা এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পূর্ণাঙ্গরূপে পালন ও তাঁর নিষেধ বর্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করাই হল সবর।

মহান স্রষ্টার আদেশ হল দ্বীন তথা ইসলামকে অন্যসব মত-পথ ও ধর্মের উপর বিজয়ী করা। আর এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনি ঐ সত্ত্বা, যিনি তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। সাফ্‌ফ-৯

তাঁরা মহান প্রভূর এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রক্ত ঝরিয়েছেন, জীবন বিলিয়ে দিয়েছেণ। তবু তাঁরা আদৌ পিছপা হননি, থমকে দাঁড়াননি, ভড়কে যাননি, আঘাত এসেছে, তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন, প্রত্যাঘাত হেনেছেন।

এটা শাশ্বত চিরসত্য যে, মানুষ যতদিন নীরব ও তোষামদের পথ অবলম্বন করবে, ততদিন কেউ তার বিরুদ্ধে উচ্যবাচ্য করবে না। কিন্তু যখনই ঘুরে দাড়াঁবে, তখন শুরু হবে নানা রকম ঝড়-তুফান। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সুতরাং আমরা কি ভাবতে পারি যে, ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্টেউ মিডিয়া আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়াবে না? আমাদেরকে উগ্রবাদী, জঙ্গীবাদী, মৌলবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, গোঁড়াবাদী, রাজাকার, চরমপন্থী, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসহ আরো হাজারো কদর্য বিশেষনে বিশেষিত করবে না? আমাদের উপর খড়গহস্থ হবে না? আমাদের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করবে না? তবে কি আমরা সব নীরবে সয়ে যাব? আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য সবরের মেওয়া পাওয়ার অপূর্ব সুযোগ মনে করে উৎফুল্ল হব?

ছিঃ ! ছিঃ!! আজ ভোগবাদী ও বিলাসী লোকগুলোর প্রতি ধিক্কার ও ঘৃণায় শরীর রি রি করে উঠে, আমরা নাকি এখনো মক্কী জীবনে আছি! মাদানী জীবনের হুকুম নাকি এখনো আমাদের উপর বর্তায়নি। জিহাদের জন্য নাকি আমাদের কোন প্রতিপক্ষ (মুসলিম বিদ্বেষী) নেই। ঘোড়া,খচ্চর আর তীর, বর্শা ছাড়া নাকি জিহাদ হয় না। এসব হচ্ছে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের পক্ষ হতে বিলাসী,দেহপূজারী ও কথিত সবরকারীদের মনঃপুত চমৎকার বাহানা।

কখন কোন্ বিষয়ে সবর করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ !(বিপদ,মুছিবত ও দুর্যোগের মুখে) ধৈর্য ধারণ কর, (কাফিরদের মুকাবিলায়) অবিচল থাক, জিহাদে দৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

আয়াতে চারটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. সবর, ২. মুসাবারাহ, ৩. মুরাবাতাহ, ৪. তাক্বওয়া।

সবর

সবর তিন প্রকার

(১) ইবাদত যত কঠিন ও কষ্টকর মনে হোক না কেন তার উপর ধৈর্যধারণ করা।

(২) নাফরমানী যত আকর্ষণীয় ও মোহনীয়ই হোক না কেন, তা থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

(৩) বিপদ-মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়া অবস্থায় সবর করা।

মুসাবারাহ

শত্রুর মুকাবেলায় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করা। শত্রুর সম্মুখ হতে পলায়ন না করা। জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন সর্বাধিক

সাহসী ও দৃঢ়। হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুর অপ্রত্যাশিত হামলার কারণে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সে কঠিন মুহূর্তে একা ইস্পাতের ন্যায় অটল দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন-

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ # أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি সত্য নবী, মিথ্যুক নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান (মুহাম্মাদ)।
কেউ কেউ সাবিরু এর অর্থ করেছেন তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর।

মুরাবাতাহ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় মুরাবাতাহ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. ইসলামী ভূখন্ডের সীমান্তের হিফাযত ও প্রহরায় নিয়োজিত থাকা।
২. নামায ও জামা'আতের এমন ইহতিমাম করা যে, এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষায় থাকা। উভয় প্রকার মুরাবাতাহর ফযীলত অসংখ্য হাদীসে রয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন-

رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রের পাহারা দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা আছে তদপেক্ষা উত্তম। (বুখারী-মুসলিম)

তাকওয়া

আলোচিত আয়াতের শেষ অংশে اتقوا الله (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।) বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকল কাজের মূল হল তাকওয়া (খোদা ভীতি)। উল্লেখিত আমলগুলোতে যদি তাক্বওয়া থাকে তবেই সফলকাম হবে, অন্যথায় এগুলোই তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।

সত্যিকার সবরের পরীক্ষা জিহাদের ময়দানেই দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ময়দানে প্রচন্ড বিভিষিকাময় পরিস্থিতিতে দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই পরীক্ষা ছাড়া ভাল ফলাফলের আশা করা যায় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللهِ اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ

তোমরা কি এই ধারণা করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ (তোমাদের উপর এখনো) সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করেনি, যারা তোমাদের পূর্বে চলে গেছে। তাদের উপর এসেছে সমূহ বিপদ ও যন্ত্রণা। তারা এমনভাবে শিহরিত হয়েছে, যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে পর্যন্ত

একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? তোমরা জেনে নাও, আল্লাহর সাহায্য অতি সন্নিকটে।" -বাক্বারা-২১৪

যেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তাঁর সাহায্য অতি সন্নিকটে সেখানে আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, তার আগে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সেই সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে তাঁর মাহবুবরূপে। জিহাদে বের না হয়ে এবং তার ন্যূনতম জযবাটুকুও না রেখে শুধু খানকার নিভৃত কোণে, আর মাদ্রাসা-মসজিদের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে বসে থেকে সত্যিকার সাবের হওয়া ও মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুত সেই স্বর্গীয় সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আসুন, আমরা ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে, গোটা বিশ্বের মুসলিম মানবতার আর্তনাদে ভারাক্রান্ত এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ঈমানী চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে সর্ব প্রকার অপপ্রচার, খোঁড়া যুক্তি ও সংশয়ের মস্তকে কুঠারাঘাত করে তাগুত আর বাতেলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার মাহবুব বান্দাদের সাথে শামিল হয়ে যাই।

আল্লাহ তা'আলার মাহবুব কারা ?

ইসলামের পূর্বেও সারা বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। আরব জাতি অতি বর্ণাঢ্য প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ করত। তাদের নীতি ছিল, সর্ব প্রথম যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ হতে একজন বীর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করতো। অতঃপর উভয় পক্ষের সৈনিকরা বিশৃংখলভাবে প্রতি পক্ষের সৈনিকদের উপর আক্রমণ করতো। তাদের যুদ্ধ ছিল নিজ বীরত্ব ও বংশীয় অহমিকা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। সুশৃংখল সমর নীতির লেশ মাত্র ছিলনা তাদের। কিন্তু ইসলামের সুমহান আদর্শ কেবল আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষেই জিহাদ শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামী সমরনীতিতে ঐশী আদেশে সুশৃংখল সারিবদ্ধ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় পাত্রদের পরিচয় দিয়ে বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর। -সাফ ঃ ৩

সারিবদ্ধতা ও সীসাগালানো প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে যুদ্ধের পদ্ধতি ইসলামী সমরনীতিতে আজো বিদ্ধমান। তবে সারিবদ্ধতার মাঝে যুগে যুগে কিছু বিন্যস্ততা হয়েছে। যেমনঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ 'তাবিয়া' নামক এক নতুন রণকৌশল চালু করেন। ইয়ারমুক ও কাদেসিয়ার প্রান্তরে এ পদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধ করা হয়।

তাবিয়ার পদ্ধতি

(১) তালিয়া (টহলদার সৈন্য)
(২) মুকাদ্দামা (অগ্রবর্তী বাহিনী)
(৩) কলব (হেড কোয়ার্টার, সিপাহসালারের অবস্থান স্থল)
(৪) মায়মানা (কালবের ডান দিকের বাহিনী)
(৫) মায়সারা (কালবের বাম দিকের বাহিনী)
(৬) সাকা (পশ্চাৎ বাহিনী)
(৭)রায়েছ (সৈনিকদের ঘাস পানি সংগ্রহকারী দল)
(৮) মুজাররাদ (অনিয়মিত বাহিনী)
(৯) রুকবানা (উষ্ট্রারোহী বাহিনী)
(১০) ফুরসানা (অশ্বারোহী বাহিনী)
(১১) রাজেল (পদাতিক বাহিনী)
(১২) রুমাত (তীরন্দাজ বাহিনী)

এ সমস্ত বাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হতো এবং তাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র দলকে কারদুল বলা হতো।

সাহাবাদের সমর কৌশল

আরবরা যোদ্ধা জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু তারা আপসে লড়াই করে নিজেদের সমস্তশক্তি ক্ষয় করতো। পরবর্তীতে ইসলামের আলো তাদেরকে দ্বীনী সূত্রে একত্রিত করে তাদের সম্মুখে মানব জীবনের এমন এক লক্ষ্য স্থাপন করে, যা ইহলৌকিক সম্মানের পাশাপাশি পারলৌকিক সৌভাগ্যের ধারক ছিল। এ উদ্দেশ্য সাধনে মুসলমানগণ আরবের প্রান্ত পেরিয়ে সম্মুখে গমন করে। ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে তারা ফারুকে আজম হযরত ওমর (রাঃ)-কে যিনি ইতিহসে শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী ও রণকুশলী ছিলেন তাঁর নেতৃত্ব লাভ করেছিল। ফলে তারা এমন তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সফলতা অর্জন করলো।এ সমস্ত যুদ্ধে তারা রণকৌশল ও নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে ইতিহাসে যার অন্য আর কোন নজীর নেই। এ বিষয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

(১) মুসলিম বাহিনী নিজ সীমানা থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করত। ফলে পরাজিত হলেও স্বদেশে প্রবেশ করে আত্মরক্ষার কোন অসুবিধা ছিলনা, বিপক্ষ দলও তাঁদের পিছনে অগ্রসর হতে সাহস পেত না। মুসলিম সৈনিকেরা প্রাথমিক যুদ্ধে এমন বীরত্বের পরিচয় দিত, যার ফলে শত্রু পক্ষের মনে ভয়ের উদ্রেক হতো এবং তারা ক্রমাগতভাবে পশ্চাত দিক সরতে শুরু করতো। ইতিহাস প্রমাণ করে, একারণেই ইয়ারমুক ও কাদেসীয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সফলতা নিশ্চিত হয়।

(২) শত্রুর দেশে প্রবেশর সময় তাঁরা সহায়ক সৈন্যের দ্বারা নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে রাখতেন। অর্থাৎ- পূর্বেই বিরুদ্ধ পক্ষের হামলার সম্ভাব্য পথ বন্ধ করে রাখা হতো। যেমন ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় ইয়াজিদ ইবনে আবু

সুফিয়ানের সাহায্য বাহিনী রিজার্ভ ছিল। অনুরূপ আলী ইবনে হাজরামীর সাহয্যার্থে ইস্তাখারে সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং বসরা থেকে আহওয়াজ পর্যন্ত সেনা চৌকি তৈরী করা হয়।

(৩) মুসলিম বাহিনী কোন শহর অবরোধ করার পর শত্রুপক্ষের যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতেন যেন কোথাও হতে তাদের সাহায্য আসতে না পারে। যেমন দামেশক জয়ের সময় হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) দশজন সেনা অফিসারের মাধ্যমে করেছিলেন।

(৪) নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলে শত্রুপক্ষের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার সাথে সাথে তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করতেন এবং শত্রুর প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ রচনা করতেন। মুছান্না ইবনে হারেছা শায়বানী ইরাকে এরূপ প্রতিরোধ গড়েছিলেন।

(৫) যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলিম সৈনিকরা অত্যাধিক সাবধানতার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। দামেশক বিজয় ছিল হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদের সামরিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন। মূলকথা, শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য কৌশল অবলম্বনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতেন না। হযরত আমর ইবনুল আস দূতবেশে আরতাবুনের সৈনিকদের মধ্যে প্রবেশ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অপরদিকে হযরত ওবায়দা ইবনে ছাবিত (রাঃ) লাজকিয়া বিজয়ের সময় নিজ বাহিনীকে পরিখাভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন।

(৬) মুসলিম সামরিক বাহিনী শত্রুপক্ষের গতিবিধির প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। প্রয়োজন হলে গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যের বাহিনী মেশিনের পার্টসের মত এক যোগে সক্রিয় হয়ে উঠত। যখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস জারিয়ার মুসলমানগণের উপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল, সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া ও ইরাকের ইসলামী বাহিনী একযোগে অগ্রসর হয়ে হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

(৭) শত্রুপক্ষের শক্তিকে বিভক্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ একাধিক সমরক্ষেত্র সৃষ্টি করতেন এবং শত্রুপক্ষ যাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সাহায্য না পৌঁছাতে পারে, তার সুব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

(৮) শত্রুর শক্তি দুর্বল করার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের লোকদের মাঝে গুপ্তচরবৃত্তি করে প্রয়োজনীয় সামরিক তথ্য সংগ্রহ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সাহাবয়ে কেরামের ন্যায় ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে প্রকৃত জিহাদে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

কেন জিহাদ করবো?

-মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

প্রকাশনায় ঃ
মাকতাবাতুল কুরআন

প্রকাশকাল ঃ
১ম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০২
২য় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০২
৩য় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

কম্পিউটার ঃ
রিয়াজ হায়দার
মাছুম বিল্লাহ

মূল্য ঃ ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ
নকীব বুক হাউজ
২৮-এ,১ টয়েনবী সার্কুলার রোড
মতিঝিল, ঢাকা।

মাকতাবাতুল কুরআন